সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী

প্রাচ্যের উপহার

তরজমায়

হাফেজ মওলানা আবু তাহের মেছবাহ
মওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল ইউসুফ
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

আমাদের কথা

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত আলিম, ইতিহাসবেত্তা এবং প্রচুর গ্রন্থের লেখক। ইসলামী চেতনার উন্মেষে তাঁর লেখনী অনন্য অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতামালার সংকলন। এই সংকলিত গ্রন্থ তোহফায়ে মাশরিক, তোহফায়ে কাশ্মীর, তোহফায়ে দাকান ও হাদীসে পাকিস্তান-এর সমন্বয়ে 'প্রাচ্যের উপহার' নাম দিয়ে বাংলা তরজমা প্রকাশ করা হল। মূল উর্দু থেকে বাংলা ভাষায় যাঁরা তরজমা করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন জনাব হাফেজ মওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের মেছবাহ, জনাব মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল ইউসুফ ও জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী।

এই বক্তৃতামালা গ্রন্থে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং ইসলামের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে, যা পাঠকমহলকে উপকৃত করবে বলে আমরা আশা করি।

আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর রিযামন্দী লাভ এবং তাঁর শুকরগুজারী করার তওফীক দান করুন। এই অমূল্য গ্রন্থের লেখক ও অনুবাদকদের জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
১০-১২-১৯৯০

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম
সম্পাদক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কে কোন্ অংশ তরজমা করলেন ঃ

অনুবাদকদের আরয

আলহামদু লিল্লাহ! অবশেষে তাঁরই অপার রহমত ও কুদরতে দীর্ঘ প্রতীক্ষা অন্তে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে প্রদত্ত সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (মা. জি. আ.)-র বক্তৃতামালা 'প্রাচ্যের উপহার' নামে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। অনুবাদ থেকে শুরু করে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া অবধি এর প্রকাশে যে দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই পেরুতে হয়েছে তা আর এক ইতিহাস। সে ইতিহাস লিখতে গেলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে বলে আমরা তা থেকে বিরত হলাম। ধৈর্যের এই দীর্ঘ পরীক্ষায় উৎরে যাবার নিবিড় আনন্দে ও সাফল্যে ওদিকটি এক্ষণে আমরা পেছনে ফেলতে চাই, উপেক্ষা করতে চাই।

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (মা. জি. আ.) আজ আর শুধুমাত্র একটি নাম নয়, একটি ইতিহাসও। কেবলমাত্র ভারতের জ্ঞানমার্গেই নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-জগতেই তিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিশেষ। একই সঙ্গে রূহানী মার্গের শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ হিসাবেও তাঁর তুলনা কেবল তিনি নিজেই। কয়েকজন বাংলাদেশী ভক্তের অব্যাহত চেষ্টায় এই বুযুর্গ মনীষী ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে ১০ দিনের এক সংক্ষিপ্ত সফরে তাঁর পূর্ব-পুরুষ সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র) ও তাঁর খলীফাবৃন্দের উর্বর কর্মক্ষেত্র এই বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। এ সময় তিনি বেশ কয়েকটি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের আয়োজিত অনুষ্ঠানে যে সব জ্ঞানগর্ভ, ঈমান-উদ্দীপক ও প্রেরণাদায়ক বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন তার ভেতর মাত্র কয়েকটি বক্তৃতার রেকর্ড করা সম্ভব হয়। আর রেকর্ডকৃত সেই বক্তৃতাসমূহ লখনৌস্থ বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারু'ল-'উলূম নদওয়াতু'ল-'উলামার প্রকাশনা বিভাগ থেকে 'তোহফা-ই মাশরিক' নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের যে ভাইদের উদ্দেশ্যে এই অমূল্য বক্তৃতাগুলো তিনি প্রদান করেছিলেন সেগুলো যাতে লিখিত আকারে পেয়ে তাঁরা উপকৃত হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে

তিনি উল্লিখিত পুস্তিকার কিছু কপি বাংলা ভাষায় তরজমা ও প্রকাশের জন্য বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন। পুস্তিকাটি হাতে পেয়েই জনাব আবু তাহের মেছবাহ তাৎক্ষণিকভাবে এটি তরজমাপূর্বক ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগে জমা দেন। পাঁচটি বক্তৃতার সংকলন এই অতি ক্ষুদ্র পাণ্ডুলিপিটি সংশ্লিষ্ট সাব-কমিটিতে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলে কমিটি পাণ্ডুলিপিটির আকার-আয়তনদৃষ্টে জনাব নদভী (মা. জি. আ.)-র এ ধরনের আরও বক্তৃতা সংকলন থাকলে সেগুলো এক সঙ্গে বৃহদাকারে প্রকাশের পক্ষে অভিমত দেন। উক্ত অভিমতের আলোকে জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে মওলানা নদভী প্রদত্ত বক্তৃতা সংকলন 'তোহফা-ই কাশ্মীর', জনাব মুহাম্মদ ইসমাঈল ইউসুফ দাক্ষিণাত্যে প্রদত্ত বক্তৃতা সংকলন 'তোহফা-ই দাকান' এবং জনাব আবু তাহের মেছবাহ পাকিস্তানে প্রদত্ত বক্তৃতা সংকলন 'হাদীছে পাকিস্তান' নামক তিনটি পুস্তিকা দ্রুত তরজমাপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দেন। অতঃপর উক্ত বিভাগের তৎকালীন পরিচালক জনাব মওলানা ফরীদউদ্দীন মাসউদ কর্তৃক তা সম্পাদিত হলে পাণ্ডুলিপিটি মুদ্রণের উদ্দেশ্যে মিল্লাত প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিকেশনস-এ দেওয়া হয়। উক্ত প্রেস ১১ ফর্মা মুদ্রণের পর অনিবার্য কারণে তাদের পক্ষে এর মুদ্রণ কাজ অব্যাহত রাখা অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় অবশিষ্ট পাণ্ডুলিপিসহ মুদ্রিত ফর্মাগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগে ফেরত দেন। অতঃপর ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস থেকে অবশিষ্ট পাণ্ডুলিপি ছাপার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এখন এটি প্রেসের লেটার কেস থেকে পাঠকের হাতে পৌঁছুবার সৌভাগ্য লাভ করছে। আল্লাহ চাহেত পাঠকের অন্তর-রাজ্যেও তা স্থান করে নিতে পারবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

উপমহাদেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম তিনটি দেশ—বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের বিশাল অংশ জুড়ে মুসলিম উম্মার প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের বাস। এই পঁয়ত্রিশ কোটি মুসলমানের জীবনে যেমন অসংখ্য সমস্যা আছে, তেমনি আছে সুপ্ত শক্তি এবং অন্তহীন সম্ভাবনাও তার ভেতর। মুসলিম জীবনের এই সব সমস্যা চিহ্নিত করে তার ভেতরকার সেই সুপ্ত শক্তি ও অন্তহীন সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে সেদিন দূরে নয় যেদিন মুসলিম উম্মার সামনে বিরাজিত হতাশার অন্ধকার আকাশে শুধু আশার সোনালী সূর্যেরই উদয় ঘটাবে না—বিশ্ব নেতৃত্বের সুমহান দায়িত্বেও তাকে অধিষ্ঠিত

করবে। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (মা. জি. আ.) আল্লাহ-প্রদত্ত অপরিমেয় জ্ঞান, মু'মিনের ফিরাসত, বহু বুযুর্গ-শ্রেষ্ঠ থেকে প্রাপ্ত সুহবতের ফয়েয এবং 'এ যুগের ইবনে বতূতা' হিসেবে সফরলব্ধ ব্যাপক অভিজ্ঞতা থেকে তিল তিল করে যা সঞ্চয় করেছেন তাঁর আলোয় তিনি উপমহাদেশের মুসলিম জীবনের সমস্যাসমূহ যেমন সুনিপুণভাবে চিহ্নিত করেছেন, তেমনি তার ভেতরকার সুপ্ত শক্তি ও সম্ভাবনার সন্ধানও উম্মার সামনে পেশ করেছেন; পেশ করেছেন উম্মার বর্তমান দায়িত্ব ও কর্তব্য কর্মের নিখুঁত দিক-নির্দেশনাও। সেই দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে দুনিয়ার বুকে নিজেকে সে খিলাফত ও ইমামতের সুবর্ণ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবে, নাকি লা'নত ও যিল্লতের গভীর আবর্তে নিক্ষেপ করবে—সেই ফয়সালা উম্মার এই পঁয়ত্রিশ কোটি সদস্যকেই গ্রহণ করতে হবে। তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে জান্নাতু'ল-'ইল্লিয়্যীনের আ'লা মকামে সে নিজের অধিবাস গড়ে তুলতে চায়—নাকি জাহান্নামের নিম্নতম প্রদেশে (في الدرك الأسفل من النار) তার অধিবাস বানাতে চায়। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে যাঁদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সর্বাধিক—দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের যাঁরা চালিকা শক্তি হিসাবে পরিচিত—সেই আলিম সমাজ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও শিক্ষকমহলের কথা এসব বক্তৃতামালায় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে, এসেছে লেখক ও কবি-সাহিত্যিকদের কথাও, এসেছে আরও অনেকের কথাই। সকলে একক ও সম্মিলিতভাবে এ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এলে গোটা বিশ্বের বর্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে—মানবতা যখন পুঁজিবাদের পর সমাজবাদের নগ্ন ব্যর্থতাদৃষ্টে তৃতীয় মতের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে দিন গুণছে—হতাশার কালো মেঘ কেটে আশার আলোক-রেখা তখন ফুটবেই।

যে দরদ দিয়ে এ বক্তৃতাসমূহ প্রদান করা হয়েছিল তা এর প্রতিটি ছত্রে পরিস্ফুট। তরজমায় আমরা সেই দরদী পরশ ধরে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। জানি না এতে আমরা কতটা সফল হয়েছি। যদি ততোধিক দরদ-ভরা মন নিয়ে এগুলো পড়া হয় এবং কিছুটাও যদি তা পাঠক মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। করুণাময় প্রভু-প্রতিপালকের মহান দরবারে আকুল মুনাজাত, তিনি যেন তাঁর হাবীব (সা)-এর গোনাহগার উম্মতকে জুলমত ঘেরা অকূল সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে মুক্তির রাজতোরণ হেরার অভিযাত্রী হবার তওফীক দেন।

পুস্তকটি বর্তমান পর্যায়ে টেনে আনতে যাঁরা বিভিন্ন প্রকার কায়িক ও মানসিক শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ মুবারকবাদ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন এ পুস্তক প্রকাশের ভার নেওয়ায় তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে এ বই-এর মূল স্রষ্টা জনাব সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (মা.জি.আ.), যিনি ইতিমধ্যেই জীবনের ৭৬টি বসন্ত পেরুতে চলেছেন—পাঠকের খিদমতে বিনীত আরয, তাঁরা যেন দু'আ করেন মুসলিম বিশ্বের এই জ্ঞানবৃদ্ধ বুযুর্গ দার্শনিককে আল্লাহ পাক যেন সুস্থ রাখেন এবং তাঁর হায়াত-দরায করেন যাতে করে আমরা তাঁর বিশাল মনীষা থেকে অকৃপণভাবে দান গ্রহণ করে নিজেদেরকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করতে পারি, করতে পারি অন্তহীন সুখ ও সৌভাগ্যের অধিকারী।

সূচী

বাংলার উপহার

দাক্ষিণাত্যের উপহার

কাশ্মীরের উপহার

পাকিস্তানী ভাইদের উদ্দেশ্যে

পরিচিতি

[বক্ষমান প্রবন্ধসমূহ মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রদত্ত পাঁচটি ভাষণের সংকলন।]

শেখ সাদী (রাহ্ঃ) বাগদাদ থেকে যখন 'সিরাজে' ফিরে আস্‌ছিলেন তখন তাঁর মনে সাধ জাগলো- সুহৃদ বন্ধু ও অনুরাগীদের জন্য তিনি কোন উপহার নিয়ে যাবেন। কিন্তু কি উপহার নেয়া যেতে পারে? অনেক চিন্তার পর তিনি রচনা করলেন ফারসী সাহিত্যের অমর সম্পদ সুবিখ্যাত নীতিগ্রন্থ 'বোস্তাঁ'। এতেই ছিলো 'সিরাজ' বাসীদের জন্য বয়ে আনা শেখ সাদীর অনবদ্য উপহার। তিনি নিজেও তাঁর এক কবিতায় সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেনঃ

"মিসর থেকে লোকেরা উপহার হিসাবে বন্ধুদের জন্য 'মিসরী' বয়ে আনে। আমি হয়তো 'মিসরী' নিয়ে যেতে পারবো না। কিন্তু ক্ষতি কি? মিস্‌রীর চেয়েও মিষ্টি কিছু কথাতো উপহার নিয়ে যেতে পারি! আমার এ 'মিসরী' হয়ত রসনা তৃপ্তির কাজে আসবে না। কিন্তু বন্ধুরা তা লিখে রেখে পথ নির্দেশনা-তো-গ্রহণ করতে পারবে।"

বলাবাহুল্য যে সুহৃদ বন্ধুও অনুরাগীদের কে এরূপ ইসলামী ও একাডেমিক উপহার দেয়ার রীতি আমাদের আকাবির ও পূর্বসূরীদের মধ্যে বহু পূর্ব থেকেই চলে আসছে। বক্ষমান বক্তৃতা সংকলনটিও বাংলাদেশী মুসলমান ভাইদের জন্য মাওলানা নাদভীর তেমনি এক অন্তর নিংড়ানো উপহার।

এখানেই সংকলনটির 'তুহ্‌ফা-ই-মাশরিক' বা পূর্ব দিগন্তের প্রতি শুভেচ্ছা নামকরণের সার্থকতা।

স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে মাওলানা নাদভী-এর কাছে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ পত্র আসতে থাকে কিন্তু আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন অনিবার্য কারণে মাওলানার পক্ষে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

দু'তিন বছর পূর্বে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার বিশিষ্ট উস্তাদ মাওলানা সুলতান যওক সাহেব ভারত সফরে এসে মাওলানাকে পুনরায়

বাংলদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। ইত্যবসরে বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের তরফ থেকেও নতুন করে আমন্ত্রণ পত্র আসা শুরু হয়। অবশেষে নয়ই মার্চ ১৯৮৪ তে মাওলানা নাদভী চারজন সফর সংগীসহ বাংলাদেশ সফরে আগমন করেন।

বাংলাদেশী ভাইদের অব্যাহত অনুরোধ ও আগ্রহ প্রতীক্ষা ছাড়াও দু'টি প্রধান আকর্ষণ মাওলানার এ সফরের পিছনে সক্রিয় ছিলো।

প্রথমতঃ পাঠক বর্গের জানা থাকবে যে, আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে যুগ-সংস্কারক হযরত সৈয়দ আহম্মদ বেরলভী তাঁর বিশিষ্ট খলীফা ও পরম প্রিয়পাত্র মাওলানা কারামত আলী জোনপুরী (রাহঃ)-কে দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুদায়িত্ব দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে ছিলেন। মাওলানা কারামত আলী (রাহঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে ছিলেন। বস্তুতঃ হযরত সৈয়দ আহ্‌মদ বেরলভী (রাহঃ-এর উপরোক্ত প্রজ্ঞা প্রসূত সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা রূপে স্থান লাভ করেছে। বাংলাদেশে মুসলমানদের বর্তমান বিপুল জনসংখ্যা এবং ধর্মীয় জাগরণের পিছনে সৈয়দ আহ্‌মদ বেরলভী (রাহঃ)-এর উপরোক্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এবং মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রাহঃ)-এর নজীর বিহীন ত্যাগ ও কুরবানীর অবদান অনস্বীকার্য।

সৈয়দ সাহেবের সাথে খান্দানী সম্পর্কের কারণে মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদভীর সুদীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ছিলো যে তিনি স্বচক্ষে তাঁর পূর্ব পুরুষদের জিহাদ ও কুরবানীর ফসল অবলোকন করে আসবেন এবং পূর্ব পুরুষদের পবিত্র ধারাবাহিকতা রক্ষা করে তিনি নিজেও সেখানকার মুসলমানদের সঠিক রাহ্‌নুমায়ী ও পথ নির্দেশনার কিছুটা খিদমত আঞ্জাম দেবেন।

দ্বিতীয়তঃ ইল্‌মী খিদমতের পাশাপাশি ইসলামী দাওয়াত ও সংস্কার-মূলক আন্দোলনই হচ্ছে মাওলানার জীবনের মূল মিশন। ইসলামী উম্মা-হ্‌র বিরাজমান অবস্থার পরিবর্তন এবং দেশে দেশে ব্যাপক ইসলামী পুনর্জাগরণ হচ্ছে তাঁর দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন। তাই ইসলামী উম্মাহ্‌র কোন আশাব্যঞ্জক সংবাদে তাঁর দরদী মন যেমন আনন্দিত হয় তেমনি কোন নিরাশাব্যঞ্জক অবস্থা পরিলক্ষিত হলে গভীর ভাবে তা আহতও হয়। মাওলানার নিকট জনেরা তাঁর দরদী মনের এ আকুতি সর্বদা

প্রত্যক্ষ করে থাকেন। মাওলানা তাঁর এ সংস্কারমূলক কর্মসূচীর অধীনে মুসলিম বিশ্বের প্রায় সব কয়টি দেশই বার বার সফর করেছেন। ইউরোপ, আমেরিকাসহ যে সমস্ত দেশে বিপুল সংখ্যক মুসলিম সংখ্যা লঘু বাস করেন সে সব দেশেও তিনি ডাক আসা মাত্রই ছুটে গিয়েছেন। সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। ফলপ্রসূ ও ভারসাম্যপূর্ণ সুসমাজ পথ-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মাওলানার প্রতিটি লেখাতেই সুগভীর জীবনবোধ, বাস্তবাদিতা এবং বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস অধ্যয়নের সুস্পষ্ট ছাপ প্রত্যক্ষ হয়। মনে হবে—একজন মু'মিন তাঁর আল্লাহ্ প্রদত্ত ঈমানী দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে সব কিছু বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাই বুঝি-ইসলামী বিশ্বের বর্তমান সমস্যাবলী এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও আশংকার চিত্র তাঁর লেখায় ও বক্তৃতায় এমন সজীব ও জীবন্ত হয়ে উঠে।

ভাব ও তথ্যগত দিক থেকে তাঁর বক্তব্য নির্ভর যোগ্য ও সারগর্ভ হওয়ার দিকে মাওলানা তাঁর প্রতিটি লেখাতেই অত্যন্ত যত্নের সাথে লক্ষ্য রেখেছেন। সর্বোপরি পাঠকবর্গ যেন তা থেকে যুগ-সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে নিতে পারেন এ দিকে থাকে তার সজাগ দৃষ্টি। তাই দেখা যায় হাযার হাযার পৃষ্ঠা লেখার পরও তাঁর সদা সক্রিয় লেখনী মঞ্জিলমুখে তার গতিময় যাত্রা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। কখনো তা দিকভ্রান্ত হয়ে তুর্কিস্তান মুখি হয়নি। এছাড়া যুগোপযোগী রচনা-শৈলী, সাহিত্যরস, ভাষার মাধুর্য ও সাবলীলতা এবং সহজ সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গি তাঁর লেখার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য বক্তৃতা সংকলনটিও উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ সংকলনে মোট পাঁচটি বক্তৃতা স্থান পেয়েছে। মাওলানার উপরোক্ত বক্তৃতগুলোও যেমন আমি প্রথমেই বলে এসেছি ইল্‌মী ও একাডেমিক, দাওয়াতী ও সংস্কার মুখি। প্রতিটি বক্তৃতায় বাংলাদেশের ইসলামী চরিত্র সংরক্ষণ এবং ইসলামের সাথে তাঁর সম্পর্ক অটুট রাখার উপর তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দীনের প্রতি বাংলাদেশী জনগণের সুগভীর অনুরাগ কষ্ট সহিষ্ণুতা, হৃদয়-মনের সারল্য ও স্বচ্ছতা ইত্যাকার প্রশংসনীয় গুণা-বলীর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—এ গুণাবলী কাজে লাগিয়ে এ জাতি দ্বারা সেই কাংক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভব যা কোন রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, ও পার্থিব শক্তি দ্বারা সম্ভব নয়।

সেই সাথে তিনি বাংলাদেশের বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষাপটে সে দেশের আলেম সমাজকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে অনৈসলামী

শক্তির হাত থেকে তাঁর নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন, এবং যথা সম্ভব স্বল্প সময়ে বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ইসলামী সাহিত্য তৈরী করার আহবান জানিয়েছেন।

বস্তুতঃ পাকিস্তান আমলের গোড়া থেকেই ভাষা সমস্যা বাংলাদেশের একটি গুরুতর ও জটিল সমস্যায় রূপ ধারণ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকার এক জনসভায় মিঃ জিন্নাহ ঘোষণা করে বসলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একক রাষ্ট্র ভাষা। মিঃ জিন্নাহর রাশভারী ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে এ ঘোষনার তাৎক্ষণিক কোন প্রবল প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত না হলেও বাংলাদেশীরা তা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। একেতো মাতৃভাষার প্রশ্নে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মতো বাংলাদেশীরাও বেশ অনুভূতি প্রবণ। তদুপরি জনসংখ্যার দিক থেকেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী বাঙালীরাই ছিলো পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান ছিলো পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত এবং প্রতিটি প্রদেশের নাম, ভাষা, ও বৈশিষ্ট্য পৃথক। ভাষা আন্দোলন যখন দুর্বার গণ আন্দোলনের রূপ ধারণ করলো তখন সে দেশের আলেম সমাজের একাংশ দুর্ভাগ্যজনক ভাবে উর্দুর পক্ষে উকালতি শুরু করলেন। ফলে গোটা জাতি থেকে তারা একে বারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এমনিতেও বাংলা ভাষার সাথে বলতে গেলে আলেম সমাজের বিরাট এক অংশের কোন সম্পর্কই ছিলো না। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আলিম সমাজকে এক কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি তাদের দেশ প্রেমকেও সন্দেহের চোখে দেখা হতে থাকে।

অন্য দিকে এটাও এক বাস্তব সত্য যে, আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান খুবই বেশী নয়। আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনৈসলামী ভাবধারার ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। প্রবাদ, উপমা ও অলংকারে দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশের ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাংক্ষার ছাপ নেই। এই অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক ও অশুভ ইঙ্গিতবাহী।

এ জন্যই মাওলানা তাঁর বক্তৃতায় মুসলিম বুদ্ধিজীবী আলেম সমাজকে বাংলাভাষা উন্নয়নে অংশ গ্রহণে ও নেতৃত্ব দানের প্রজ্ঞাময় পরামর্শ দিয়েছেন। ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে ইসলামী-দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা প্রসংগে আরবী ও ফারসী ভাষার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—ইসলাম পূর্ব যুগে আরবী ভাষা ছিলো একটি শিরকবাহী ভাষা, অথচ আজ ইসলামকে বাদ দিয়ে

আরবী ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করার কোন উপায় নেই। তদ্রূপ ফারসী ভাষাকে মনে করা হয় মুসলমানদের ভাষা। কেননা আলেম ও ইসলামী চিন্তা নায়কগণ ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। হিন্দুস্তানী আলিমগণও উর্দু ভাষাকে অন্যের নিয়ন্ত্রণে যেতে দেননি। ফলে আজ একথা কেউ বলতে পারে না যে, উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলিম সমাজ দুর্বল।

বাংলা ভাষার সাথে বাংলাদেশী আলিমদের আচরণ অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। বাংলা ভাষা উন্নয়নে এবং বিশ্ব সাহিত্যের অংগনে তাকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে আলেম সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। যেন ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারা রেফারেন্সের মর্যাদা লাভ করতে পারেন। মাওলানা অত্যন্ত আবেগ ও দরদ নিয়ে বাংলাদেশী আলেমদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় এ কথাগুলো বলেছেন। মাওলানা এ সফর কালে ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোমেনশাহী ও সিলেটের বিভিন্ন গুরুত্ব পূর্ণ স্থানে গিয়েছেন। ঢাকা অবস্থান কালে মুসলিম শাসনামলের ঐতিহ্যবাহী রাজধানী সোনার গাঁ তেও গিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ সফরকালে যারা মাওলানার সব রকম সুযোগ সুবিধার প্রতি সদা সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন তাদের মধ্যে মাওলানা সুলতান যওক সাহেব (উস্তাদ জামেয়া ইসলামিয়া পাটিয়া) জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া (তৎকালীন মহাপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) হাজী বশীরুদ্দীন সাহেব প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাদের সকলের আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার মনে রাখার মত।

মাওলানা আবুল ইরফান নাদভী
(প্রধান শরীয়া বিভাগ, নাদওয়াতুল উলামা লাখনৌ)

ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞাবোধ

[১০ই মার্চ ১৯৮৪ বাদ আসর জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার বার্ষিক সভায় প্রদত্ত ভাষণ। এ ভাষণের মাধ্যমেই মাওলানার বাংলাদেশের সফর-সূচী অনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয়।

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

আমার প্রিয় বাংলাদেশী ভাই ও বন্ধুগণ। আপনারা আমার সালাম ও মুবারকবাদ গ্রহণ করুন। প্রথমেই আমি আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে নিজের এই ত্রুটি ও অপরাধ স্বীকার করছি যে, উপমহাদেশীয় মুসলমানদের বৃহত্তম অংশের আবাসভূমি বাংলাদেশে আমার দীনি ভাইদের খিদমতে আমি অনেক বিলম্বে জীবনের প্রায় সায়াহ্নকালে এসে হাযির হয়েছি। এটাকে আমি আমার বিরাট ত্রুটি বলেই মনে করি। তাই আজ আল্লাহ্‌র এই পবিত্র ঘরে এবং এই মহান ইসলামী শিক্ষাঙ্গনের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে এ ত্রুটির জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্‌ আমার এ অপরাধ ক্ষমা করুন। দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জন-সংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের এই সবুজ শ্যামল শান্ত, স্নিগ্ধ মাটিতে যেখানে ইসলামী উম্মাহর নয় কোটি তাওহীদী সন্তানের অধিবাস; যাদের মুখে কালেমার সুমধুর গুঞ্জন আর বুকে ঈমানের দৃপ্ত সজীব স্পন্দন; যারা শুধু আল্লাহ্‌র সামনেই নত করে তাদের উন্নত শির এবং রাসূলের পবিত্র জীবনাদর্শেই যারা দেশে ও সমাজ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর, সেখানে সেই ধর্মপ্রাণ দীনি ভাইদের খিদমতে অনেক আগেই আমার এসে হাযির হওয়া উচিত ছিলো।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ

عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٥

"যখন তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তবে তোমাদেরকে আমি আরো প্রাচুর্য দান করবো। আর যদি কৃতঘ্ন হও—তবে মনে রেখো; আমার শাস্তি ভীষণ কঠিন।

(সূরা ইবরাহীম ঃ ৭)

বস্তুতঃ সচরাচর এরূপ দেখা যায় যে, অন্য জাতির সমাজ ও জীবন ব্যবস্থায় জাঁকজমক পূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক কোন উপকরণ দেখতে পেলে নিজেদের অজ্ঞাত সারেই মানুষ সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। এই সুযোগে শয়তানও তার কাঁধে ভর করে। বিভিন্ন উপায়ে তাকে প্রলুব্ধ করতে থাকে। "আহা! আমাদের সমাজ ও জীবন ব্যবস্থায়ও যদি এ চিত্তাকর্ষক উপাদানগুলো সংযোজিত হতো!" দুনিয়ায় কত জাতিই তো এমন রয়েছে যারা তাওহীদের সুনির্মল বিশ্বাস এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। কেউ মেতে আছে পালাপর্বন ও মেলা উৎসবে, কেউ বা প্রাণহীন মূর্তি পূজায়। কেউ দেবতার পায়ে অর্পণ করছে পুষ্পস্তবক, কেউবা মন্দিরে মন্দিরে বিলাচ্ছে দেবতার ভোগ। অবাধ চিত্তবিনোদন ও উচ্ছৃংখল রস রূপ উপভোগের রকমারি উপায় উপকরণে তাদের উৎসব অনুষ্ঠান-গুলো হয়ে উঠে নরক গোলযার। এমন নাযুক মুহূর্তে অনেক তাওহীদবাদী জাতিরই পদস্খলন ঘটেছে। মুহূর্তের অসতর্কতায় শয়তানের কূট প্ররোচনার শিকার হয়েছে তারা। ভাবে কিংবা বক্তব্যে তখন তারা এমনও আকাংক্ষা প্রকাশ করতে শুরু করেছে যে, আহ! আমাদেরও যদি এমন সুযোগ হতো।

দুনিয়ার অনেক জাতিই লা-শরীক আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে গায়রুল্লাহ্‌র অরাধনায় মত্ত হয়েছে। কেউ জাতীয়তাবাদকে, কেউ উগ্র স্বদেশিকতাকে, কেউ ভাষা ও বর্ণবাদকে. কেউবা পূর্বপুরুষদের অতীত গৌরবকে গ্রহণ করেছে উপাস্য দেবতা রূপে। কিন্তু ইসলামী উম্মাহকে আল্লাহ্‌ পাক এসব শয়তানী ধূম্রজাল থেকে মুক্ত রেখেছেন। আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ঃ যত মনোহর ও চিত্তাকর্ষকই হোক—তোমাদের দৃষ্টি যেন ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি প্রলুব্ধ না হয়।

কিন্তু মানবেতিহাসের দুর্ভাগ্য এই যে, এ পিচ্ছল পথে অনেক অসতর্ক জাতিরই পদস্খলন ঘটেছে। উপাদেয় খাদ্য দেখে অভুক্তের জিভে যেমন পানি আসে তেমনি ভিন্ন জাতির বাহ্যিক জৌলুস পূর্ণ ঐশ্বর্য দেখে তাদের জিভেও পানি এসে পড়েছে। মনে সুঁড়সুড়ি জেগেছে। এমনকি আল্লাহ্‌র প্রিয় ও নির্বাচিত জাতিরও পা ফসকে গেছে। বানু ইসরাঈলের কথাই ধরুন এক শ্রেষ্ঠ নবীর সান্নিধ্য ও সহচর্য আল্লাহ্‌ পাক তাদেরকে দান করেছিলেন। কিন্তু এতো বড় সৌভাগ্যও তাদের শেষ রক্ষা করতে পারেনি। তাদের পা টলে গেলো। মূর্তি পূজার বাহ্য আড়ম্বর দেখে তারাও প্রলুব্ধ হলো। তাদের মনেও সুঁড়সুড়ি জাগলো "আহা! এমন কিছু আমরাও যদি করতে পারতাম।" সূরাতুল আ'রাফেও বনী ইসরা-ঈলের ঘটনা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ○ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

"বনী ইসরাঈলকে আমি সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। পরে তারা মূর্তি পূজায় রত এক জাতির সংস্পর্শে এলো। তারা বলে বসলো হে মূসা ! ওদের যেমন দেবতা আছে, তেমনি আমাদের জন্যও একটি দেবতা এনে দাও। তিনি বললেন তোমরা দেখছি মূর্খের দল। ওরা তো এক ধ্বংসকর কাজে লিপ্ত রয়েছে, এবং তারা যা করছে তা ভ্রান্ত ও অমূলক।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৩৮—১৩৯)

অন্যত্র বনী ইসরাঈলীদের লক্ষ্য করে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ○

"হে বনী ইসরাঈল ! তোমাদের উপর আমি যে অনুগ্রহ করছি তা স্মরণ করো। আর একথাও স্মরণ করো যে, বিশ্বে সবার উপর তোমাদেরকে আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (সূরা বাকারা ঃ ৪৭)

তাফসীর গবেষকদের মতে তৎকালীন মানব গোষ্ঠির উপর বনী ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠত্ব ও শীর্ষ মর্যাদা লাভের উৎস ছিলো তাওহীদের প্রতি তাদের অবিচল বিশ্বাস। মূলতঃ তাওহীদ ও একাত্ববাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। সমসাময়িক জাতিবর্গের তুলনায় তারা অধিক আল্লাহ্ভীরু ও একত্ববাদী ছিলো। কিন্তু মিশর ভূমিতে বছরের পর বছর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের তারবিয়াত ও ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভের পরও তাদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছিল তা আল-কুরআনের ভাষায় শুনুন—

يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

"হে মূসা ! ওদের যেমন দেবতা আছে তেমনি আমাদের জন্যও একটি দেবতা এনে দাও।"

সম্ভবতঃ সেখানে মীনা বাজার বসেছিল, ভোজ সভারও আয়োজন ছিলো, আরো হয়তো ছিলো নাচ গান ও সঙ্গীতের উদ্দাম অনুষ্ঠান। এ ধরনের উৎসব পর্বে উপরোক্ত ব্যবস্থাদি থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। ভিন্ জাতির সে রঙ্গ রস ও জৌলুস পূর্ণ এবং নৃত্য-সঙ্গীত মুখর উৎসব দেখে মূসা আলায়হিস্ সালামের এতদিনের সযত্ন সাধনায় গড়া শিক্ষা ও আদর্শ তারা মুহূর্তেই বিস্মৃত হয়ে গেলো। আল্লাহ্র নবীর কাছে তারা আব্দার জুড়ে দিলো ঃ হে মূসা ! ওদের যেমন দেবতা আছে তেমনি আমাদের জন্যও একটি দেবতা এনে দাও; যাকে আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাবো, স্পর্শ করতে পারবো এবং যার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে আমরা আত্ম তৃপ্তি পাবো।

এমন অদ্ভুত আব্দার শুনে হযরত মূসা জ্বলে উঠলেন। বললেন ঃ মূর্খ, অপদার্থ ও কৃতঘ্নের দল ! এতদিন ধরে তোমাদেরকে তাওহীদের শিক্ষা দিলাম, শিরকের পাপ পংক থেকে উদ্ধার করে আনলাম, আল্লাহ্র কাছে দরখাস্ত করে মান্না-সাল্ওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দিলাম। অথচ আজ সেই তোমরাই আববার জুড়ে দিয়েছো নাচ-গান ও রঙ্গ তামাশার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য ? "এরা তো ধ্বংসকর কাজে লিপ্ত রয়েছে, এবং এরা যা করছে তা নিছক ভ্রান্ত ও অমূলক।"

বস্তুতঃ বনী ইসরাঈলীদের দুর্ভাগ্য ও অধঃপতনের ইতিহাস আমাদের জন্যে এক জ্বলন্ত শিক্ষা, এক চরম সতর্কবাণী। দীর্ঘ যুগ ধরে যে জাতি আল্লাহ্র পয়গম্বর হযরত মূসার নবী সুলভ তারবিয়াত ও দীক্ষা লাভ করে পূর্ণ ও পরিণত হলো ; নাযুক পরীক্ষার মুহূর্তে তাদেরও পা ফসকে গেলো। তারাও আব্দার জুড়ে দিলো মুশরিকদের পদাংক অনুসরণের ঃ "এমনি এক স্থূল খোদা আমাদেরকে এনে দাও যাকে চোখে দেখে আমরা উপাসনা করতে পারি।"

আরো সীমিত পর্যায়ে প্রায় একই ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছিলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া-সাল্লামের যুগে। হিজাযে একটি গাছ ছিলো। সে গাছতলায় আরবের মুশরিকরা পশু বলি দিতো এবং গোটা একটা দিন আনন্দে সেখানে কাটিয়ে দিতো। 'সিহাহ সিত্তায়' বর্ণিত হয়েছে যে, হুনায়ন যুদ্ধের যাত্রা কালে একদল নওমুসলিম রাসূলুল্লাহ্ আলায়হি ওয়া-সাল্লামের কাছে গিয়ে আবেদন জানালো ঃ আমাদের জন্য এমন

কোন একটি গাছ তলা নির্দিষ্ট করে দিন যেখানে আমরা আনন্দ উৎসবের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক মেলায় সমবেত হতে পারি।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করলেন—হযরত মূসাকে বনী ইসরাঈলীরা যা শুনিয়ে ছিলো সেই একই কথা আমাকেও তোমরা শোনাচ্ছো!

اجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ

"ওদের যেমন দেবতা আছে আমাদের জন্যও তেমনি একটা দেবতা এনে দিন।" তোমরাও কি সে জাতির পদাংক অনুসরণ করতে চাও!!
(ইবনে হিসাম খ. ২ পৃঃ ৪৪২)

একবার এক জিহাদের সফরে জনৈক আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে সামান্য বাক বিনিময় হয়ে গেলো। তখন আনসারী সাহাবী বলে উঠলেন ঃ

يَا لَلْاَنْصَارِ

কোথায় আনসার দল! ছুটে এসো, সাহায্য করো! দেখা দেখি অপর জনও মুহাজিরদের লক্ষ্য করে অনুরূপ ডাক দিলেন। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া-সাল্লামের গোচরীভূত হলে তিনি উভয় জামা'আতকে লক্ষ্য করে বললেন: এ প্রথা পরিত্যাগ করো, এটা দুর্গন্ধময় নাপাক প্রথা।

ভাই ও বন্ধুগণ! এ কথা মনে রাখতে হবে যে শয়তান আমাদের বিরুদ্ধে ও'তপেতে বসে আছে এবং মুহূর্তের জন্যেও সে তার মিশন থেকে গাফিল হয় না। নিত্য নতুন কৌশলে মানুষকে সে বিভ্রান্তির পথে প্ররোচিত করে। বারবার মুখোশ পালটায়। কে কোন কৌশলে প্রভাবিত হবে এবং কাকে কোন পন্থায় ইসলামের চির সরল পথ থেকে বিচ্যুত করা যাবে এসব তার নখদর্পণে। আলিম পরিবারে গিয়ে সে চুরির কথা বলবে না। কেননা এটা তার ভালো করেই জানা আছে যে, আলেম ও বুযুর্গের সন্তান চৌর্য বৃত্তির মতো হীন কাজে লিপ্ত হতে কিছুতেই প্রস্তুত হবে না। সেখানে সে ভিন্ন পথে এগুবে। তাদেরকে আত্মম্ভরী ও অহংকারী করে তুলবে। পূর্বপুরুষদের কীর্তি গাঁথা নিয়ে বড়াই ও লড়াই করার তালিম দেবে। তদ্রূপ ব্যবসায়ী মহলে গিয়ে প্রথমে সে ওযনে ফাঁকি দেবার কিংবা অবৈধ পথে কালো টাকার পাহাড় গড়ে তোলার ফন্দি-

ফিকির বাতলে দেবে। অনুরূপ ভাবে সে জাতিকে আল্লাহ্র দীন ও ঈমানের বিরাট দৌলতদান করেছেন। ইল্‌ম ও আমল, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা, সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতা এবং ইসলামী সৌভ্রাতৃত্বের নিয়ামত দান করেছেন; তাদের কানে সে এ ধরনের মন্ত্র দেবে ঃ ইসলাম কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের বিষয় নয়। মুসলমান তো সকলেই। ভৌগোলিক সীমারেখা, ভাষা, বর্ণ কিংবা জাতীয়তাই হচ্ছে আমাদের বৈশিষ্ট্য, আমাদের গর্ব ও গৌরবের বিষয় এবং এগুলোকেই আমাদের আঁকড়ে ধরা উচিত।

এটা শয়তানের সেই মোক্ষম হাতিয়ার যা সে এমন সুবর্ণ মুহূর্তে অত্যন্ত সুকৌশলে প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু সকল শয়তানী প্ররোচনার মুখেও তাওহীদের রজ্জুকেই মযবুতভাবে আপনাদের আঁকড়ে ধরতে হবে।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

"তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকেই মযবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আল-ইমরান ঃ ১০৩)

ইসলামী উম্মাহ্র মাঝে ফাটল ও বিভেদ সৃষ্টির অশুভ উদ্দেশ্য নিয়েই শয়তান জাতীয়তাবাদ, বস্তুবাদ, বর্ণবাদ ও ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতাসহ বিভিন্ন রকমের শয়তানী জাল বিছিয়ে দেয়। তাওহীদবাদী উম্মাহ্ সে ইন্দ্রজালে এমন ভাবে ফেঁসে যায় এবং আপাত মধুর শ্লোগানে এতই মোহগ্রস্ত ও বিভোর হয়ে পড়ে যে, তখন এক মুসলমান অন্য মুসলমানের খুন প্রিয়াসী হয়ে উঠে। মুসলমানের হাতে মুসলমানের আবাদ ঘর বিরাণ হয়। মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়। অসহায় বৃদ্ধ মুখ থুবড়ে পড়ে। নিষ্পাপ কচি শিশুর চাঁদ-মুখ নিষ্ঠুর পদাঘাতে থেতলে যায়, তবু হায়েনার উন্মত্ত জিঘাংসা এতটুকু প্রশমিত হয় না।

বন্ধুগণ! এ শয়তানী জাল আমাদের ছিন্ন করতে হবে। ইসলামের উপরই শুধু আমাদের গর্ব করা উচিত। ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের সাথেই কেবল আমাদের ভালবাসা থাকা উচিত। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ আল্লাহ্ পাকের দরবারে এক হাবশী গোলামের মর্যাদা অভিজাত বংশীয় একজন সুখী সুন্দর মানুষের চেয়ে অধিক হতে পারে। কেননা

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۝

"তোমাদের মধ্যে যে অধিক মুত্তাকী, আল্লাহ্‌র দরবারে সেই অধিক সম্মানের অধিকারী।" আল্লাহ্‌র দরবারে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপ-কাঠি হলো তাক্‌ওয়া ও ইবাদত এবং ইল্‌ম ও আমল।

لا فضل لعربي على عجمي و لا لعجمي على عربي الا بالتقوى

"অনারবের উপর আরবের কিংবা আরবের উপর অনারবের, তদ্রূপ কালোর উপর সাদার কিংবা সাদার উপর কালোর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" ভাষা ও বর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের মাপ-কাঠি নয়। তাক্‌ওয়ার ভিত্তিতেই কেবল আল্লাহ্‌র মর্যাদা লাভ করা যেতে পারে। তুমি কোন ভাষায় কথা বলো কিংবা তোমার চামড়ার রং কালো না সাদা আল্লাহ্‌ পাক দেখবেন না। তিনি শুধু দেখবেন; তোমার ইল্‌ম ও আমল কতটুকু ইখলাসপূর্ণ। তোমার হৃদয় কতটুকু পবিত্র ও সহানুভূতি প্রবণ। তোমার সালাত কতটুকু নিখুঁত কতটুকু সুন্দর। ইসলামের প্রতি তোমার অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা কতখানি। এক কথায় আল্লাহ্‌ ও রাসূলের সাথে যার প্রেম যত গভীর, আল্লাহ্‌র দরবারে তার মর্যাদাও তত অধিক। ইসলামের সম্বন্ধই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম সম্বন্ধ। এজন্যই আল্লাহ্‌ পাক আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে ইরশাদ করেছেন:

ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا

"শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রুরূপেই গণ্য করো।" অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم

"তোমরা না দেখলেও শয়তান ও তার অনুচরেরা কিন্তু তোমাদেরকে ঠিকই দেখে।"

শয়তানের গতিবিধি খুবই সূক্ষ্ম ও রহস্যময়। কখনো সে মানুষের উপর ভর করে আসে। কখনো শত্রুর বেশে আসে, আবার কখনো আসে বন্ধুর বেশে। সব ভাষাতেই তার সমান দখল এবং তার ভাষা শৈলীও আমাদের চেয়ে আকর্ষণীয়। বড় হৃদয়গ্রাহী পন্থায় সে তার বক্তব্য উপস্থাপন করে। অতএব এখন খতরনাক শত্রুর ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকুন। ইসলামের রজ্জুকে মযবুত ভাবে আঁকড়ে ধরুন। ইসলামকে নিয়েই শুধু

গর্ব করুন। ইসলামের জন্যই জীবন ধারণ করুন এবং প্রয়োজন হলে ইসলামের জন্যই জীবন উৎসর্গ করুন। ইসলামের জন্যই শুধু আল্লাহ্‌র দেওয়া এ প্রাণ উৎসর্গ করা যেতেপারে, কিন্তু ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর জন্য দেহের এক ফোটা রক্তও ব্যয় করার অধিকার কারুর নেই।

যে কোন শয়তানী শ্লোগান হঠাৎ করে যতই ফেনায়িত হয়ে উঠুক তা ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ্‌ শুধু চিরস্থায়ী। ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে (১৯৬৫—৬৬) আরব বিশ্বের গোটা দিগন্ত আঁধার করে জাহেলিয়াতের এক প্রচন্ড ঝড় উঠেছিলো। তখন এমন এক ব্যক্তির আকস্মিক অভ্যুদয় ঘটেছিলো যে তার যাদুময়ী ব্যক্তিত্ব দ্বারা লক্ষ লক্ষ আরব তরুণকে মোহাচ্ছন্ন করে ছেড়ে ছিলো। কিন্তু অল্প কদিনের মধ্যেই বুদ্বুদের মতো সব কিছু মিলিয়ে গেলো। আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের নামই কেবল সমুন্নত থাকলো। বায়তুল্লাহ্‌ মসজিদে নববী ও কিতাবুল্লাহ্‌ তেমনি অম্লান থেকে গেলো। মাঝখান থেকে সে নিজে নিক্ষিপ্ত হলো ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। কেননা বাতিলের তেলেসমাতি খুবই ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামই শুধু কিয়ামত পর্যন্ত সমুন্নত থাকবে। সুতরাং হে বন্ধুগণ! ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর উপর গর্বিত হওয়া উচিত নয়। ইসলামের 'না'রা' ছাড়া অন্য কোন শ্লোগান যেন হয় আপনাদের মন-মগজ আচ্ছন্ন করতে সক্ষম না হয়। কেবল কা'বা কেন্দ্রিকই যেন হয় আপনাদের জীবনের পরিক্রমা। ইসলামের প্রতি অনুরাগ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হচ্ছে ইসলামের রজ্জুকে মযবুত ভাবে আঁকড়ে ধরা। আল্লাহ্‌র দরবারে আমি সকাতর প্রার্থনা করছি। তিনি আপনাদের আমাদের এবং সকল মুসলমানের দিল ও ঈমানের হিফাযত করুন! আল্লাহুম্মা আমীন।

প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার বিজয়

[ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক মাওলানার সম্মানে প্রদত্ত ১৩ই মার্চের ভোজ সভার ভাষণ। উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত ভোজ সভার দেশের বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, লেখক গবেষক ও চিন্তাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।

হামদ ও সালাতের পর।

জনাব মহা পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ।

আজকের ভোজ সভা উপলক্ষে বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিবর্গ, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও বিদগ্ধ জনদের এই মহতি সমাবেশে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও অভিভূত। বস্তুত পক্ষে আমার জন্য এটাই উচিত ছিলো যে, আমি নিজেই ঘরে ঘরে গিয়ে বন্ধুদের সাথে মিলিত হবো। এবং হৃদয়ের কিছু কথা তাদের খিদমতে হাদীয়া রূপে পেশ করবো। কিন্তু এতো বড় শহরে এই সংক্ষিপ্ত সফরে একজন মুসাফিরের পক্ষে এটা কিছুতেও সম্ভব হতো না। তাই আমি জনাব আব্দুল ফায়েদ মুহম্মদ ইয়াহিয়া সাহেবের শুকরিয়া আদায় করছি। ভোজ সভা উপলক্ষে এমন সুবর্ণ সুযোগ তিনি আমাকে দান করেছেন। এছাড়া এক জায়গায় এক সাথে এত বিরাট সংখ্যক দীনী ভাইদের সাথে একত্র হওয়ার সৌভাগ্য ও হয়তো আমার হতো না।

আমি আপনাদের সামনে অসংকোচে স্বীকার করছি, এই মুহূর্তে বাংলা ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে আমার অন্তরে অনুশোচনা হচ্ছে। আজ আপনাদের সাথে আপনাদের ভাষায় হৃদয়ের ভাব বিনিময় করতে পারলে আমার আনন্দের সীমা থাকতো না। পৃথিবীর সকল ভাষাই আল্লাহ্‌র দান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক এই মহান দান ও ইহ্‌সানের কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কোন মানবীয় দুর্বলতা হিসাবে নয় বরং প্রশংসা ও গুণ রূপেই মানব জাতির ভাষাগত বৈচিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّلْعٰلِمِينَ ٥

"আকাশ ও যমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণ বৈচিত্র তাঁরই নির্দশন সমূহের কয়েকটি। জ্ঞানীদের জন্য এতে চিন্তার খোরাক রয়েছে।"

(সূরা রূম ঃ ২২)

এটা কোন দোষের কথা নয়। কোন দুর্বলতা নয়। আর বাংলা ভাষাতো মুসলমানদের ভাষা। মুসলমানদের হাতেই এর জন্ম, প্রতি পালন ও সমৃদ্ধি। আপনারা অবশ্য অবগত আছেন যে, আরবী বর্ণমালাই ছিলো বাংলা ভাষার আদি বর্ণমালা। সর্বোপরি বাংলা ভাষা আজ জ্ঞান ও সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই বিরাট ঐশ্বর্য মণ্ডিত। এই উপমহাদেশের একজন বাসিন্দা হিসাবে সর্বোপরি একজন মুসলমান হিসাবে বাংলা ভাষার সাথে পরিচয় থাকাটাই ছিলো স্বাভাবিক। আজ যদি বাংলা ভাষায় আমি আপনাদের সম্বোধন করতে পারতাম তাহলে সেটা আশ্চর্যের কোন বিষয় হতো না। কিন্তু এটা আমার দুর্বলতা, আমার ত্রুটি, আপনাদের সাথে আপনাদের প্রিয় ভাষায় আমি কথা বলতে সক্ষম নই। অবশ্য এর একটা যুক্তিসংগত বিকল্প পন্থা এ হতে পারতো যে, আরবী ভাষায় আমি আমার বক্তব্য পেশ করতাম আর আপনারা তা বুঝে যেতেন। কেননা আরবী হচ্ছে ইসলামী উম্মাহ্‌র সরকারী ভাষা। ইসলামী বিশ্বের সবচেয়ে প্রিয় ও পরিচিত ভাষা।

প্রিয় সুধী বৃন্দ! পীর আওলিয়া ও উলামা মাশায়েখের এ পুণ্য ভূমিতে পদার্পণ করার সাথে সাথেই আমার অন্তর পুলকিত ও ভাবে তন্ময় হয়ে আছে। আমি মূলতঃ ইতিহাসের ছাত্র। আমার স্থির বিশ্বাস যে, এই ভূখণ্ডে ইসলামী উম্মাহ্‌র এই বিরাট জনসংখ্যার উপস্থিতি প্রকৃত পক্ষে নিঃস্বার্থ মানব প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার ফসল। যদি রাজনৈতিক স্বার্থের আবর্জনা মুক্ত ইখলাস ও মুহব্বত এবং আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও মানব প্রেমের মতো মহান গুণাবলী না হতো তবে এই বৈচিত্র পূর্ণ ভৌগলিক সীমা রেখার মধ্যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুতে বিশ্বাসী একজন মুসলমানের অস্তিত্বও কল্পনা করা সম্ভব ছিলো না। একজন সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করাও আজ আমাদের কাছে, দুঃসাধ্য মনে হয়। অথচ আমাদের পূর্ব পুরুষগণ কত সহজেই না লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ের বদ্ধ

দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। ঈমান ও ইখলাসের আলো জেলে শতাব্দীর অন্ধকার মুহূর্তে দূর করে দিয়েছিলেন। এখানে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা এবং গোটা উপমহাদেশে মুসলমানদের এই বিরাট জন সংখ্যা কোন সামরিক অভিযানের ফসল নয়। আমি পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সাথেই আপনাদের খিদমতে আরয করতে চাই যে, দুনিয়ার যে সব অঞ্চলে ইসলামী সেনাবাহিনীর আগমন ঘটেনি সেখানে মুসলমানগণ আজ সংখ্যা গরিষ্ঠ। আর যে সব অঞ্চলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম শাসকদের অপ্রতিহত রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো সেখানকার মুসলমানগণই আজ সংখ্যালঘু।

ভূস্বর্গ রূপে পরিচিত গোটা কাশ্মীর ভূখণ্ডই হযরত আমীর-ই-কবীর সৈয়দ আলী হামদানীর প্রেম ও ভালোবাসার ফসল। আল্লাহ্‌র এই প্রেমিক বান্দা ইরান থেকে এলেন। কাশ্মীরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আস্তানা গাড়লেন। আর দেখতে দেখতেই ভালোবাসার স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরীর হৃদয় জয় করে নিলেন। অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্যরা পর্যন্ত দলে দলে ছুটে এসে তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করে নিলো। তাদেরও হৃদয়ে ঈমান ও ইখলাস এবং প্রেম ও পুণ্যের এক অনির্বাণ শিখা জ্বলে উঠলো। এটা ছিলো ইখলাস ও আধ্যাত্মিকতা এবং আবদিয়াত আল্লাহ্‌র প্রতি দাসত্ববোধ ও মানব প্রেমেরই বিজয়।

আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও মানব প্রেম যখন সম্মিলিত হয়; এই দুটি উচ্ছল নদীর স্রোতধারার যখন সংগম ঘটে; একজন মানুষ যখন আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও মানব প্রেমের শীতল স্নিগ্ধ সরোবরে অবগাহন করে পূত পবিত্র হয়ে উঠে তখন তার বিজয় ও অগ্রযাত্রা হয় অপ্রতিরোধ্য। ঈমানের নূরের রেখা তখন অন্ধকারের বুক চিরে মানুষের হৃদয় রাজ্যের পানে নিজেই নিজের পথ করে নেয়। আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও মানব প্রেম এমনি এক মহা শক্তি যে, দেশের পর দেশ লুটিয়ে পড়ে তার পায়ে। পাষাণ হৃদয়ও মুহূর্তে বিগলিত হয়ে যায়। সেখান থেকেও তখন উৎসারিত হয় প্রেম বিশ্বাসের স্বচ্ছ সুনির্মল ঝরণা ধারা। কেননা প্রেম এক সংগমক শক্তি। অতীতের মতো আজো পৃথিবীর যাবতীয় বিপদ সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে ইখলাস ও আধ্যাত্মিকতা এবং নিঃস্বার্থ মানব প্রেম ও মানব সেবা দ্বারা।

এই পূর্ব বঙ্গেও অনেক ওলী দরবেশ এবং জীর্ণ বস্ত্রধারী আল্লাহ্‌র অনেক প্রেমিক পুরুষ এসেছিলেন। শ্রেণী ও বর্ণ বৈষম্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত আদম সন্তানদের ভালো বেসে তাঁরা বুকে তুলে নিয়েছিলেন।

ইখলাছের আলো জেলে শতাব্দীর অন্ধকার মুহূর্তে দূর করে দিয়েছিলেন। এখানে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা এবং গোটা উপমহাদেশে মুসলমানদের এই বিরাট জন সংখ্যা কোন সামরিক অভিযানের ফসল নয়। আমি পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সাথেই আপনাদের খিদমতে আরয করতে চাই যে, দুনিয়ার যে সব অঞ্চলে ইসলামী সেনাবাহিনীর আগমন ঘটেনি সেখানে মুসলমানগণ আজ সংখ্যা গরিষ্ট। আর যে সব অঞ্চলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম শাসকদের অপ্রতিহত রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো সেখানকার মুসলমানগণই আজ সংখ্যালঘু।

ভূস্বর্গ রূপে পরিচিত গোটা কাশ্মীর ভূখণ্ডই হযরত আমীর-ই-কবীর সৈয়দ আলী হামদানীর প্রেম ও ভালাবাসার ফসল। আল্লাহর এই প্রেমিক বান্দা ইরান থেকে এলেন। কাশ্মীরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আস্তানা গাড়লেন। আর দেখতে দেখতেই ভালবাসার স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরীর হৃদয় জয় করে নিলেন। অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্যরা পর্যন্ত দলে দলে ছুটে এসে তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করে নিলো। তাদেরও হৃদয়ে ঈমান ও ইখলাছ এবং প্রেম ও পুণ্যের এক অনির্বাণশিখা জ্বলে উঠলো। এটা ছিলো ইখলাছ ও আধ্যাত্মিকতা এবং আবদিয়াত আল্লাহর প্রতি দাসত্ববোধ ও মানব প্রেমেরই বিজয়।

আল্লাহর দাসত্ব ও মানব প্রেম যখন সম্মিলিত হয়; এই দুই উচ্ছল নদীর স্রোতধারার যখন সংগম ঘটে; একজন মানুষ যখন আল্লাহর দাসত্ব ও মানব প্রেমের শীতল স্নিগ্ধ সরোবরে অবগাহন করে পূত পবিত্র হয়ে উঠে তখন অন্ধকারের বুক চিরে মানুষের হৃদয় রাজ্যের পানে নিজেই নিজের পথ করে নেয়। আল্লাহর দাসত্ব ও মানব প্রেম এমনি এক মহা শক্তি যে দেশের পর দেশ লুটিয়ে পড়ে তার পায়ে। পাষান হৃদয়ও মুহূর্তে বিগলিত হয়ে যায়। সেখান থেকেও তখন উৎসারিত হয় প্রেম বিশ্বাসের স্বচ্ছ সুনির্মল ঝর্ণা ধারা। কেননা প্রেম এক সংগমক শক্তি। অতীতের মতো আজো পৃথিবীর যাবতীয় বিপদ সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে ইখলাস ও আধ্যাত্মিকতা এবং নিঃস্বার্থ মানব প্রেম ও মানব সেবা।

এই পূর্ব বঙ্গেও অনেক অলী দরবেশ এবং জীর্ণ বস্ত্রধারী আল্লাহর অনেক প্রেমিক পুরুষ এসেছিলেন। শ্রেণী ও বর্ণ বৈষম্যের যাঁতাকলে নিঃস্পেষিত আদম সন্তানদের ভালোবেসে তাঁরা বুকে তুলে নিয়েছিলেন।

এদেশের স্বার্থান্বেষী সমাজ পতিরা আদম সন্তানদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিলেন। একদল হলো মানুষ আরেকদল হলো সেই সব হতভাগ্য আদম সন্তান যাদের সাথে যে কোন ধরণের পাশবিক আচরণই ছিলো পুণ্যের কাজ। বস্তুতঃ পশুর চেয়েও নীচে ছিলো তাদের সামাজিক অবস্থান। কুকুরের স্পর্শে মানুষ অপবিত্র হতোনা কিন্তু অদৃশ্য আদম সন্তানদের ছায়া মাড়ালেও স্নান করে পবিত্র হতে হতো। সেই অধঃপতিত আদম সন্তানদের কাছে আল্লাহর প্রেমিক বান্দারা এসেছিলেন ইসলামের পয়গাম নিয়ে, তাওহীদের বাণী নিয়ে এবং মানবিক সাম্য ও ঐক্যের বার্তা বহন করে।

আরবদের মতো সাম্প্রদায়িক ও ভাষাগত উন্নাসিক জাতির দ্বিতীয় কোন নযীর মানব জাতির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের এই জাতীয় উন্নাসিকতা এত প্রকট ছিলো যে, অন্যান্য জাতিকে আজমী (বাকশক্তিহীন) নামে অভিহিত করতো। আরবী ভাষার মোকাবেলায় পৃথিবীর অন্য কোন ভাষাকে তারা ভাষা বলেই স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলো না। সেই পরিবেশে সেই উন্নাসিক জাতিকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদাত্ত ঘোষণা দিলেন ঃ

إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم من آدم وآدم من تراب

لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود

ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى

"তোমাদের রব ও প্রতিপালক এক। তোমাদের আদি পিতা এক। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির তৈরী। অনারবের উপর আরবের এবং আরবের উপর অনারবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তদ্রূপ কালো চামড়ার উপর সাদা চামড়ার এবং সাদা চামড়ার উপর কালো চামড়ার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া খোদাভিরুতা। তিনি তাদেরকে কোরআনের নিম্নোক্ত বাণী শোনালেন ঃ"

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل

لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ٥

"হে মানবজাতি ! এক জোড়া নর ও নারী থেকে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে তোমাদের বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই অধিক মর্যাদার অধিকারী যে অধিক মুত্তাকী।" [সূরা—হুজরাত—১৩]

শ্রেষ্ঠ বংশ কুরাইশের শ্রেষ্ঠ গোত্র বণী হাশিমের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ মুহাম্মদ আরাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন ; হে মানব জাতি ! হে আরব অনাবর ! তোমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক যেমন এক, তেমনি তোমাদের আদি পিতাও অভিন্ন। সুতরাং দুই দুইটি সূত্রে তোমরা একে অপরের ভাই। একই স্রষ্টার সৃষ্টি হিসাবে এবং একই পিতার সন্তান হিসাবে তোমাদের সত্তা এক ও অভিন্ন। বস্তুতঃ এ দুটি মূল বুনিয়াদের উপর ভর করেই দাঁড়িয়ে আছে মানবতার সুদীর্ঘ ইতিহাস। এর যে কোন একটিতে ফাটল ধরলেই মুহূর্তের মধ্যে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে মানব সভ্যতার এই সুউচ্চ সৌধ। মানুষে মানুষে সাম্য ও সম্প্রীতির এ বাণী বহন করেই অলী দরবেশ ও সুফী সাধকগণ এদেশে এসেছিলেন এবং তাদের হাতেই এদেশে ইসলামের প্রসার ঘটেছিলো। মানুষের বুদ্ধি বৃত্তির পরিবর্তে তাদের হৃদয়ের কোমল অনুভূতিকে তারা সম্বোধন করেছিলেন ; এবং মুখের ভাষার পরিবর্তে হৃদয়ের ভাষাতেই তারা মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন। কেননা মুখের ভাষা বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু হৃদয় আত্মার ভাষা সর্বত্র এক ও অভিন্ন। প্রেম ও সত্যের ভাষা চিরন্তন ও শাশ্বত। সব দেশে সব কালে তা একই রকম বোধগম্য। এমনকি এজন্য কোন দোভাষীরও প্রয়োজন হয় না। চোখের মমতা সিক্ত স্নিগ্ধ চাহনী, মুখের শুভ্র মধুর মৃদু হাসি এবং হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত প্রেম ও ভালবাসার ঝর্ণাধারা পাষাণ হৃদয় শত্রুকে; এমনকি বনের হিংস্র নেকড়েকেও বশীভূত করে ফেলতে পারে এক মুহূর্তে। প্রেম ও ভালোবাসার বিজয় এমনি অপ্রতিহত, অপ্রতিরোধ্য !

আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, আপনারা শুধু ঢাকার নয়, গোটা বাংলাদেশের মেধা ও হৃদপিন্ড এই সভায় একত্রিত হয়েছেন। আপনাদের এ মোবারক সমাবেশ দেখে আমার অন্তরে এ আশার সঞ্চার হয়েছে যে, যে দেশে এতো বিপুল সংখ্যক ইসলামের প্রতি নিবেদিত প্রাণ বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ রয়েছেন ; যেদেশের মানুষের মনে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর প্রতি

ভালোবাসা এতো গভীর যে, এক পরদেশী ভাইয়ের হৃদয়ের ব্যথা মিশ্রিত কথা শোনার জন্য নিজেদের সকল প্রকার ব্যস্ততা বিসর্জন দিয়ে ছুটে আসতে পারেন, ইসলামের সাথে সে দেশের হৃদয় ও আত্মার বন্ধন কখনও শিথিল হতে পারেনা। মান ও পরিমাণ (Quality & Quantity) উভয় বিচারেই আজকের এ সভা বেশ গরুত্ব পূর্ণ। আল্লাহ্ পাকের রহমতের উপর ভরসা রেখে পরম নির্ভরতার সাথে আমি এ মজলিসে দাঁড়িয়ে বলতে চাই যে, ইনশাআল্লাহ্! আপনাদের মতো নিবেদিত প্রাণ বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও বিদগ্ধ জনদের উপস্থিতিতে বুদ্ধি বৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইসলামের সাথে এ দেশের সম্পর্ক কোন দিন শিথিল হবে না। দিন দিন তা বরং বৃদ্ধিই পাবে।

আমাকে আপনারা অত্যন্ত মূল্যবান উপহার দিয়েছেন, একস্থানে একই সাথে বাংলাদেশের নির্বাচিত ব্যক্তিদের সম্বোধন করার যে সুযোগ দান করেছেন তার চেয়ে বড় উপহার আর কি হতে পারতো!

সুধীবৃন্দ! আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি অনুভব করছি আমার বক্তব্য বেশ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। এ অনুভূতিও আমার রয়েছে যে, আমি ভোজ সভায় আপনাদের সাথে কথা বলছি। বন্ধুগণ! ভোজ সভা হয়ত কপালে আরো জুটবে। কিন্তু আপনাদেরকে এভাবে এক সাথে আমি আর কবে কোথায় পাবো!

আমি আপনাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই—এবং এটা কোন তোষামোদ কিংবা চাটুকারিতা নয় যে, কর্মের ময়দান রূপে আপনাদেরকে আল্লাহ পাক এমন এক সরল কোমল মনের অধিকারী, ধর্মপ্রাণ এবং ইসলামের প্রতি অনুগত জনশক্তি দান করেছেন যা ইসলামী বিশ্বের খুব কম দেশেই আমি দেখেছি। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমি আপনাদের খিদমতে আরয করছি যে এ নিয়ামতের যথাযোগ্য কদর আপনাদের করা উচিত। ঝানু রাজনীতিবিদ কিংবা জাঁদরেল কূটনীতিবিদের খোঁজ আপনি পৃথিবীর অনেক দেশেই পাবেন। বিস্ময়কর প্রতিভাবান লোকেরও হয়ত কমতি হবে না। কিন্তু ইখলাছ ও মুহব্বত এবং সরল চিত্ততা ও হৃদয়াদ্রতা সবখানে আপনি খুঁজে পাবেন না। সৌভাগ্যের বিষয় যে, আপনাদের দেশে এগুলো পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। এ গুলো আপনাদের আগে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। এমন মূল্যবান সম্পদের এমন নির্দয় অপচয় কিছুতেই মার্জনীয় হতে পারেনা।

একবার আমি TOROMTO তে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাকে NIAGARA FALL দেখতে নিয়ে যাওয়া হলো। এটা নাকি পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি।

কয়েক হাজার 'ফিট' উচ্চতা থেকে প্রবল বেগে প্রচন্ড শব্দে অনবরত পানি নেমে আসছে। সে এক আজব ব্যাপার। পৃথিবীর সব দেশ থেকেই পর্যটক দল এই জল প্রপাত দেখতে যায়। আমিও গিয়েছিলাম। আচ্ছা, বলুন তো! এই বিশাল জলপ্রপাত থেকে যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা না হয় কিংবা সেচ ও কৃষি কাজে তা ব্যবহৃত না হয় তবে কি একে এক বিপুল সম্ভাবনাময় সম্পদের অপচয় বলে গণ্য করা হবে না। মনে রাখবেন, তদ্রূপ আপনাদেরকেও আল্লাহ পাক প্রবল শক্তিধর এক জলপ্রপাত দান করেছেন। সেটা হলো ঈমান ও ইখলাছের জলপ্রপাত। প্রেম ও সত্যের জলপ্রপাত; যা আমি এ জাতির মধ্যে প্রত্যক্ষ করছি। এ জলপ্রপাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করুণ দেখবেন যে সব সমস্যা আজ জটিল ও সমাধানের ঊর্ধ্বে বলে মনে হচ্ছে, এক নিমিষেই তার সরল সমাধান হয়ে যাবে। আমি আবার বলছি, কর্মের ময়দান রূপে এক সম্ভাবনাময় জাতি আপনাদেরকে দান করা হয়েছে। কর্মের এমন সর্বোত অনুকূল ময়দান আমি পৃথিবীর খুব কম দেশেই দেখেছি। এ জাতি থেকে যে কোন কাজ আপনারা নিতে পারেন। তবে এটা পেশাদার রাজনৈতিক নেতাদের কাজ নয়। এ হচ্ছে ঈমান ও বিশ্বাস এবং ইখলাছ ও প্রেম পূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিদের কাজ, আপন জাতিকে যারা কল্যাণকর কিছু দেয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ অথচ প্রতিদানের প্রত্যাশী নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেযামন্দি লাভই যাদের চরম ও পরম লক্ষ্য, এ জাতিকে তারা পরশ পাথরে পরিণত করতে পারে। আমি সম্ভাবনার এমন আলোক রশ্মি দেখতে পাচ্ছি যে, এ জাতি একদিন শুধু বাংলাদেশেই নয় বরং গোটা আলমে ইসলামীতে এক নতুন শক্তি সঞ্চার করতে সক্ষম হবে। কিন্তু এ মনোরম স্বপ্নের বাস্তবায়ন শুধু তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা আল্লাহ প্রদত্ত উপরোক্ত নিয়ামত গুলোর কদর করবো। সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার করবো। এ জাতি মহা শক্তিধর এক জলপ্রপাত। একে আপনারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করুণ। দীর্ঘ দিন থেকে এ বিপুল সম্ভাবনাময় সম্পদের অপচয় হয়ে আসছে এবং এখনো হচ্ছে। এ প্রবাহমান জলপ্রপাত থেকে যদি সঠিক ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয় তবে শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশই নয় গোটা আরব বিশ্বও সে আলোর স্নিগ্ধ পরশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে।

আমি আবার বলছি, এ জাতির আপনারা যোগ্য মর্যাদা দিন। প্রবীন ও নবীনদের মাঝে এবং আলেম সমাজ ও আধুনিক শিক্ষিত সমাজের আজ যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং ক্রমশঃ যে ব্যবধান বিস্তৃত হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব তা অপনোদন করুণ। উভয়ের মাঝে সেতু বন্ধন রচনা করুণ,

এবং পরস্পর পরিচিত হোন; আলিঙ্গনাবদ্ধ হোন। উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই কেবল এ দেশকে, এ জাতিকে অফুরন্ত ঈমানী শক্তির আধার এবং ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহ্‌র পতাকা বরদার রূপে গড়ে তুলতে পারে। আপনারা ইসলামী উম্মাহ্‌র দ্বিতীয় বৃহত্তম পরিবার। এ পরিবারের প্রতিটি সদস্যকেই স্ব-স্ব দায়িত্ব, শক্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন হতে হবে।

অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি আবারো আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি যে, নতুন শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাকে আপনারা ওয়াকিফহাল করেছেন। এক নতুন আশাবাদের দোলায় আমার হতাশ হৃদয় আবার সজীব হয়ে উঠেছে। ইসলামী বিশ্বের ঘটনাবলী, লেবাননের মর্মান্তিক পরিণতি, ইরাক-ইরান ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ, আরব জাহানের সম্পদ মোহ ও বিলাস-প্রিয়তা সর্বোপরি ইসলামী উম্মাহ্‌র চরম নির্লিপ্ততা আমার হৃদয়ে বারবার যে রক্ত ক্ষরণ ঘটাচ্ছে তাতে আপনারা আজ কিঞ্চিত পরিমাণে হলেও শীতল প্রলেপ দিয়েছেন। মনে হচ্ছে, এখনো ইসলামের সৌভাগ্য তারকা আলো বিকীরণ করতে পারে। কে বলতে পারে; এখান থেকেই হয়ত শুরু হবে ইসলামী পূর্ণ জাগরণের বিজয় যাত্রা।

একজন উপমহাদেশীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবি হিসাবে (যেমন আমার পরিচয় দেয়া হয়েছে) আমি দেখতে পাচ্ছি অযাচিত ভাবেই প্রয়োজনীয় সকল যোগ্যতা আল্লাহ পাক আপনাদের দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্‌। কোন কিছুরই অভাব আপনাদের মধ্যে নেই। এখন প্রয়োজন শুধু ইসলামের বন্ধনকে অন্য সকল বন্ধনের উপর প্রাধান্য দেওয়া। কোন শ্লোগানই যেন ইসলামের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে না পারে। আল্লাহর সাথে হতে হবে আমাদের আসল সম্পর্ক। সকলকেই একদিন সেখানে ফিরে যেতে হবে। ঈমান ও বিশ্বাস এবং ইখলাছ ও আমল ছাড়া কোন কিছুই কাজে আসবে না সে দিন।

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতিই আমাদের হৃদয়ে থাকবে প্রেম ও মমতা। পৃথিবীর সব ভাষার প্রতি থাকবে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাবোধ। দেশের ও মায়ের ভাষাকে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার জন্য আমরা আমাদের সবকিছু উজাড় করে দেব। কিন্তু কোন ভাষার প্রতিই আমাদের ঘৃণা থাকবে না। আমিতো এতদূর পর্যন্ত বলতে চাই যে, আপনারা হিন্দুস্তানে আলেম সাহিত্যিকদের প্রতিনিধি দল প্রেরণ করুন; যারা হিন্দুস্তানীদেরকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত

করার ক্ষেত্রে কাংখিত ভূমিকা পালন করবে। গোত্রীয় সম্প্রদায়িকতা এবং ভাষা ভিত্তিক উন্নাসিকতার সাথে ইসলামের ইতিহাস পরিচিত নয়। মুসলমানগণ সব ভাষাই শিক্ষা করেছেন। সব ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। সারগর্ভ ইসলামী সাহিত্য দ্বারা একেকটি ভাষাকে সমৃদ্ধশালী ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন। ফারসী ভাষার কথাই ধরুন। অগ্নি পূজকদের পশ্চাদপদ ভাষা ছাড়া তার স্বতন্ত্র কোন পরিচয় ছিলো না। ইসলামই তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে। গতি ও উচ্ছলতা দান করেছে। ফারসী সাহিত্যের অমর পুরুষ শেখ সাদী, হাফিজ, সিরাজী, জালালুদ্দীন রুমী—এরা ইসলামেরই ফসল। অন্য ভাষার ইতিহাস পড়ে দেখুন; একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবেন সেখানেও।

এদেশে যে প্রতিষ্ঠানটি আমাকে সবচেয়ে বেশী আশান্বিত করেছে তা হচ্ছে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ। এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব যেমন ব্যাপক, সম্ভাবনাও তেমনি বিপুল। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে বুদ্ধিজীবি ও আধুনিক শিক্ষিত তরুনদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ইসলামের প্রতিটি শাখার পর্যাপ্ত সাহিত্য গড়ে তোলা। ভাষা, রচনাশৈলী, আঙ্গিক, উপস্থাপন ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ সাহিত্যকে হতে হবে মনোত্তীর্ণ ও আকর্ষণীয়। যেন সহজেই তা পাঠকচিত্ত জয় করে নিতে পারে এবং সঠিক বুদ্ধিবৃত্তিক পথ নির্দেশনা দিতে পারে। আমার দৃষ্টিতে এ প্রতিষ্ঠান এদেশের ইসলামী পুর্ণজাগরণের সোনালী ভবিষ্যতেরই এক পূর্বাভাষ।

এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, এবং সর্বশেষে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশকে আবারো মোবারকবাদ জানাচ্ছি; যার ব্যবস্থাপনায় আজ এ সুবর্ণ ও ঐতিহাসিক সুযোগ আমি লাভ করেছি। আল্লাহ্‌ আমাদের সহায় হোন।

বাংলা ভাষার নেতৃত্ব গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

[১৪ মার্চ ১৯৮৪ জামিয়া-ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ প্রাঙ্গনে বিশিষ্ট আলেম বুদ্ধিজীবি ও ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ। ভূমিকাতে হিন্দুস্তানী উলামাদের সংস্কার মূলক কর্মকান্ড ও তার ফলাফল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে তিনি মূল বক্তব্যে ফিরে যান।]

উপস্থিত আলেম ওলামা, বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক ও আমার প্রিয় বন্ধুগণ!

আপনাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে দেশ জাতির প্রতিটি মুহূর্তের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা। আপনারা এ জাতির ঈমান ও বিশ্বাসের অতন্দ্র প্রহরী। ইসলামের সাথে এ দেশের সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই যেন বিন্দুমাত্র শিথিল না হয় সে ব্যাপারে আপনাদেরকে পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। যে দেশ এবং যে জাতির জন্য আল্লাহ পাক আমাদের নির্বাচিত করেছেন তাদের ব্যাপারে অবশ্যই আপনাদেরকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহী করতে হবে। ইসলামের সাথে এ দেশের সম্পর্ক যদি বিন্দুমাত্র শিথিল হয় কিংবা অনৈসলামী কার্যকলাপ ও ইসলাম বিরোধী তৎপরতা শুরু হয় তবে মনে রাখবেন ; রাসূলের ওয়ারিছ ও উত্তরাধিকারী হিসাবে আপনাদেরকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। রাজনৈতিক কর্ণধাররা জিজ্ঞাসিত হবে কিনা প্রশ্ন এখানে নয়। কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, সর্বপ্রথম আলেমদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হবে। তোমাদের চোখের সামনে আমার রেখে আসা দ্বীনের এমন অসহায় অবস্থা কি ভাবে হতে পারলো ? কোন মুখ নিয়ে আজ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছো ? প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহ বলেছিলেন—আমি বেঁচে থাকতে দ্বীনের কোন অঙ্গহানী ঘটবে এটা কি করে হতে পারে ?

এই মুহূর্তে আপনাদেরকে খুঁটিনাটি মত পার্থক্য সিকায় তুলে রেখে এক বৃহত্তর ও মৌলিক লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটে নিপতিত জাতির এই মুহূর্তে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ পথ নির্দেশনার বড় প্রয়োজন। ইখলাছ ও আত্মত্যাগ এবং প্রেম ও নিঃস্বার্থতা দিয়ে জাতির সেই অংশটিকে প্রভাবিত করুণ যাদের হাতে দেশ শাসনের ভার অর্পিত হয়েছে কিংবা অদূর ভবিষ্যতে যাদের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হতে

যাচ্ছে। এ যুগে শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য অপরিহার্য জ্ঞান, দক্ষতা ও উপকরণ যাদের হাতে রয়েছে, জাতির সে অংশটির সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা আপনাদের অপরিহার্য কর্তব্য। তাদেরকে তাদের ভাষায় বোঝাতে হবে। আপনাদের সম্পর্কে তাদের মনে এ বিশ্বাস যেন থাকে যে, আপনারা নিঃস্বার্থ এবং প্রকৃতই কল্যাণকামী। তাদের কাছে যেন আপনাদের কোন প্রত্যাশা না থাকে, বিভিন্ন প্রলোভন ও সুযোগ সুবিধার কথা হয়ত বলা হবে। এ এক কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা। নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর তখন অটল অবিচল থাকতে হবে। কেননা আপনাদের বিনিময় আল্লাহর হাতে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টির দিকে আমি আপনাদের সযত্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো এদেশের ভাষা (বাংলা ভাষা) কে আপনারা অস্পৃশ্য মনে করবেননা। বাংলা ভাষা ও তার সাহিত্য চর্চায় কোন পুণ্য নেই, যত পুণ্য সব আরবী আর উর্দূতে, এ ধারণা বর্জন করুন। এটা নিছক মূর্খতা নিজেদেরকে বাংলা ভাষার বিরল প্রতিভা রূপে-গড়ে তুলুন। আপনাদের প্রত্যেককে হতে হবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক, সাহিত্যিক, ও বাগ্মী বক্তা। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় আপনাদের থাকতে হবে দৃপ্ত পদচারণা লেখনী হতে হবে রস-সিক্ত ও সম্মোহনী শক্তির অধিকারী যেন আজকের ধর্ম বিমুখ শিক্ষিত তরুন সমাজ ও অমুসলিম লেখক সাহিত্যিকদের লেখনী ছেড়ে আপনাদের সাহিত্য কর্ম নিয়েই মেতে উঠে, বিভোর হয়ে থাকে।

দেখুন; একথা আপনারা লাখনৌর অধিবাসী, উর্দু ভাষার প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং আরবী ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী এক ব্যক্তির মুখ থেকে শুনছেন। আল-হামদুলিল্লাহ্! আমার বিগত জীবন আরবী ভাষার সেবায় কেটেছে এবং আল্লাহ্ চাহেন বাকী জীবনও আরবী-ভাষার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবো। আরবী ভাষা আমাদের নিজেদের ভাষা। বরং আমি মনে করি যে আরবী আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের কথা থাকুক। আল্লাহর শোকর আমার বংশের অনেক সদস্যদের এবং আমাদের অনেক ছাত্রের সাহিত্য প্রতিভাও খোদ আরব সাহিত্যিকদের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

বন্ধুগণ! উর্দু ভাষার পরিবেশে যে চোখ মেলেছে, আরবী সাহিত্যের খিদমতে যে তার যৌবন নিঃশেষ করেছে সে আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সাথে বলছে-বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলাম বিরোধী শক্তির রহম করমের উপর ছেড়ে দেবেন না। "ওরা

লিখবে আর আপনারা পড়বেন" ঐ অবস্থা কিছুতেই বরদাস্ত করা উচিত নয়। মনে রাখবেন, লেখনীর এক অদ্ভুত প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তি আছে। লেখনীর মাধ্যমে লেখকের ভাব-অনুভূতি, এমনকি তার হৃদয়ের স্পন্দনও পাঠকের মধ্যে সংক্রমিত হয়। অনেক সময় পাঠক হয়ত তা-অনুধাবনও করতে পারেনা। ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান লেখকের লেখনী পাঠকের অন্তরেও সৃষ্টি করে ঈমানের বিদ্যুৎ প্রবাহ। হযরত থানভী (রাহঃ) বলতেনঃ পত্র যোগেও মুরীদের প্রতি তাওয়াজ্জুহ বা মানোযোগ-নিবদ্ধ করা যায়। শায়খ বা পীর তাওয়াজ্জুহ্ সহকারে মুরীদকে লক্ষ্য করে যখন পত্র লিখেন তখন সে পত্রের অক্ষরে অক্ষরে থাকে এক অত্যাশ্চর্য প্রভাব শক্তি। এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও রয়েছে। পূর্ববর্তী পুণ্যাত্মদের রচনা-সম্ভার আজো মওজুদ রয়েছে। পড়ে দেখুন, আপনার সালাতের প্রকৃতি বদলে যাবে। হয়ত পঠিত বইটির বিষয় বস্তুর সাথে সালাতের কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু তিনি যখন লিখছিলেন তখন তাঁর তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ ছিলো। এখন আপনি তাদের লেখনী পড়ে তারপর গিয়ে সালাত আদায় করুন। হৃদয় জাগ্রত এবং অনুভূতি সচেতন হলে অবশ্যই আপনি উপলব্ধি করবেন যে, আপনার সালাতের অবস্থা ও প্রকৃতি বদলে গেছে। অনেক বারই আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। আপনি অমুসলমানদের লেখনী পড়বেন ; তাদের রচিত গল্প উপন্যাস ও কাব্যের রস-উপভোগ করবেন এবং তাদের লিখিত ইতিহাস নির্দ্ধিধায় গলধঃকরণ করবেন অথচ আপনার হৃদয়ে তার কোন দাগ কাটবেনা, এটা কি করে হতে পারে? আপনার অবচেতন মনে হলেও 'লেখনী' তার নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করবেই। আমি মনে করি, আপনাদের জন্য এটা বড় লজ্জার কথা। বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত না হলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না যে, এ দেশ যে দেশে এ পর্যন্ত লক্ষাধিক আলেমের জন্ম হয়েছে, সেখানে বাংলায় কোরআনের প্রথম তরজমা কারী হচ্ছেন একজন হিন্দু সাহিত্যিক।

এদেশের মুসলিম সাহিত্যিকদেরকে বিশ্বের দরবারে আপনারা তুলে ধরুন, নজরুল ও ফাররুখকে তুলে ধরুন, তাদের অনবদ্য সাহিত্য কর্মের কথা বিশ্বকে অবহিত করুন। নিবিষ্ট মন ও গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে তাদের সাহিত্য পড়ুন, অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করুন এবং আল্লাহ্ তাওফীক দিলে আরবী ভাষায়ও তাদের সাহিত্য পেশ করুন। কত শত আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাহিত্য প্রতিভার জন্ম এদেশে হয়েছে। তাদের কথা লিখুন, বিশ্বের কাছে তাদেরকে তুলে ধরুন। আল্লাহর রহমতে

এমন কোন যোগ্যতা নেই যা আপনাদেরও দেয়া হয়নি। আমাদের মাদরাসা গুলোতে এমন অনেক বাঙ্গালী ছাত্র আমি দেখেছি যাদের মেধা ও প্রতি-ভার কথা মনে হলে এখনো ঈর্ষা জাগে। প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষার সময় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররা তাদের মুকাবিলায় একেবারেই চুপসে যেতো। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে মানপত্র দেওয়া হয়েছে। আমার এ ধারনাই ছিলোনা যে, এতো সুন্দর আরবী লেখার লোকও এখানে রয়েছে। কখনো হীনমন্যতার স্বীকার হবেন না। সব রকম যোগ্যতাই আল্লাহ্ আপনাদের দান করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এগুলোর সঠিক ব্যবহার হচ্ছেনা।

আমার কথা মনে রাখবেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে নিতে হবে। দু'টি শক্তির হাত থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে। অমুসলিম শক্তির হাত থেকে এবং অনৈসলামী শক্তির হাত থেকে। অনৈসলামী শক্তি বলতে সেই সব নামধারী মুসলিম লেখক সাহিত্যিকদের কথাই আমি বোঝাতে চাচ্ছি যাদের মন-মগজ এবং চিন্তা ও কর্ম ইসলামী নয়। মোট কথা, এ উভয় শক্তির হাত থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে। এমন অনবদ্য সাহিত্য গড়ে তুলুন যেন অন্য দিকে কেউ আর ফিরেও না তাকায়। আল-হামদুলিল্লাহ্! আমাদের হিন্দুস্তানী আলিমগণ প্রথম থেকেই এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। ফলে সাহিত্য, কাব্য, সমালোচনা ও ইতিহাস সহ সর্বত্র আজ আলেম সমাজের দৃপ্ত পদচারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাদের উজ্জল প্রতিভার সামনে সাহিত্যের বড় বড় দাবীদাররা একেবারেই নিষ্প্রভ। একবার একটি প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় উর্দু সাহিত্য সাময়িকীর তরফ থেকে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগীদের দায়িত্ব ছিলো উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নির্বাচন। বিচারকদের দৃষ্টিতে পুরস্কার তিনিই লাভ করলেন—যারা মাওলানা শিবলী নো'মানীকে উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে প্রমাণ করেছিলেন। উর্দু সাহিত্যের উপর কোন গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন কিংবা সেমিনার হলে সভাপতিত্বের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নাদভী, মাওলানা আব্দুস-সালাম নাদভী, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান কিংবা—মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীকে। উর্দু কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসের উপর দু'টি পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত। সে দুটি হচ্ছে মওলভী মুহম্মদ হুসাইন আযাদ কৃত "আবে হায়াত" এবং আমার মরহুম পিতা মাওলানা সৈয়দ আব্দুল হাই কৃত "গুলে রানা" (কোমল গোলাপ)।

মোট কথা; হিন্দুস্থানে উর্দু সাহিত্যকে আমরা অন্যের নিয়ন্ত্রণে যেতে দেইনি। ফলে আল্লাহর রহমতে সেখানে একথা কেউ বলতে পারে না যে, মাওলানারা উর্দু জানেনা কিংবা টাকসালী উর্দুতে তাদের হাত নেই। এখনও হিন্দুস্থানী আলেমদের মধ্যে এমন লেখক; সাহিত্যিক ও অনলবর্ষী বক্তা রয়েছেন, যাদের সামনে দাঁড়াতেও অন্যদের সংকোচ বোধ হবে। বাংলাদেশে আপনাদের তাই করা উচিত। আমার কথা আপনারা লিখে রাখুন। দীর্ঘ জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন কিংবা বিমাতাসুলভ আচরণ এদেশের আলেম সমাজের জন্য জাতীয় আত্ম হত্যারই নামান্তর।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমার এ দু'টি কথা মনে রেখো। এর বেশী কিছু আমি বলতে চাই না। প্রথম কথা হলো—এই দেশ ও জাতির হিফাযতের দায়িত্ব তোমাদের। ইসলামের সাথে এদেশের সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই যেন শিথিল হতে না পারে। অন্যথায় তোমাদের এই শত শত মকতব মাদরাসা মূল্যহীন হয়ে পড়বে। আমি সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আমার কথায় দোষ ধরোনা। আমি মাদরাসারই মানুষ, মাদরাসার চৌহদ্দী-তেই কেটেছে আমার জীবন। আমি বলছি, আল্লাহ্ না করুণ ইসলামই যদি এদেশে বিপন্ন হলো তবে মকতব—মাদরাসার কোনই যৌক্তিকতা নেই। তোমাদের পয়লা নম্বরের কাজ হচ্ছে এদেশে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করা। ইসলামের সাথে জাতির সম্পর্ক অটুট রাখা। দ্বিতীয় কথা হলো; যে কোন মূল্যে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব এবং সঠিক পথ নির্দেশনা নিজেদের হাতে নিতে হবে। আর তা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধি-বৃত্তিক প্রাধান্য অর্জন ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। গতকালও আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় বলেছি যে, আমার খুবই আফসোস হচ্ছে—আমি আপনাদের সাথে বাংলা ভাষায় কথা বলতে সক্ষম নই। আপনাদের ভাষায় আপনাদের সম্বোধন করতে পারলে আজ আমার আনন্দের সীমা থাকতো না। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ভাষাই বিদেশী কিংবা পর নয়। পৃথিবীর সকল ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি; এবং প্রত্যেক ভাষারই রয়েছে নিজস্ব কতগুলো বৈশিষ্ট। ভাষা বিদ্বেষ হলো জাহেলিয়াতেরই উত্তরাধিকার। কোন ভাষা যেমন পূজনীয় নয়, ঘৃণ্যও নয়। একমাত্র আরবী-ভাষাই পেতে পারে পবিত্র ভাষার মর্যাদা। এছাড়া পৃথিবীর আর সব ভাষাই সম মর্যাদার অধিকারী। মানুষকে আল্লাহ পাক বাক শক্তি দিয়েছেন এবং যুগে যুগে মানুষের মুখের ভাষা উন্নতি ও সমৃদ্ধির বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করে বর্তমান

রূপ ও আকৃতি নিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। মুসলমান প্রতিটি ভাষাকেই মর্যাদা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কেননা মনের ভাব ফুটিয়ে তুলতে পৃথিবীর সকল ভাষাই আমাদেরকে সাহায্য করে। প্রয়োজন যে কোন ভাষা শিক্ষা ইসলামেরই নির্দেশ। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) কে হিব্রু ভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ হিব্রু হচ্ছে নির্ভেজাল ইহুদী ভাষা। দেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমরা যদি উদাসীন ও নির্লিপ্ত থাকি তবে তা স্বাভাবিক ভাবেই অনৈসলামিক শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। ফলে যে ভাষা ও সাহিত্য হতে পারতো ইসলাম প্রচারের কার্যকর মাধ্যম তাই হয়ে দাঁড়াবে শয়তানের শক্তিশালী বাহন। আপনাদের এখানে কলকাতা থেকে অশ্লীল সাহিত্য আসছে। সাহিত্যের ছদ্মাবরণে কমিউনিজমের প্রচার চলছে। ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংসের মাল-মশলা তাতে মিশানো হচ্ছে। আর সরলমনা তরুণ সমাজ গোগ্রাসে তাই গিলছে। এর পরিণতি কখনো শুভ হতে পারেনা।

ভাইসব! আপনারা তিরমিযী মিশকাত কিংবা মিযানের শরাহ্ লিখতে চাইলে তা আরবী উর্দুতে লিখুন, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু জনগনকে বোঝাতে হলে জনগনের ভাষাতেই কথা বলতে হবে। আমি আপনাদের খিদমতে পরিস্কার ভাষায় বলতে চাই—পাক ভারতে হাদীছ, তাফসীর ও ফিকাহ শাস্ত্রের উপর এপর্যন্ত অনেক কাজ হয়েছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যাখ্যা গ্রন্থও লেখা হয়ে গেছে। সেখানে নতুন সংযোজনের বিশেষ কিছুই নেই, আপনাদের সামনে এখন পড়ে আছে কর্মের এক নতুন বিস্তৃত ময়দান, দেশ ও জাতির উপর আপনাদের নিয়ন্ত্রণ যেন শিথিল হতে না পারে, আপনাদের দেশের মানুষ যেন মনে না করে যে, দেশে থেকেও আপনারা বিদেশী, স্বদেশের মাটিতে এই প্রবাস জীবন অবশ্য-ই ত্যাগ করতে হবে। মনে রাখবেন, এদেশের মাটিতেই আপনাদের থাকতে হবে এবং এদেশের জনগণের মাঝেই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। এদেশের সাথেই আপনাদের ভাগ্য, আপনাদের ভবিষ্যত জড়িত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

إنّ دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة

يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا فليبلغ الشاهد الغائب

হে মুসলমানগণ! তোমাদের খুন, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের আবরু ইজ্জত পরস্পরের জন্য হারাম।

ভাষাগত পার্থক্যের কারণে কোন মুসলমান ভাইকে অপমান করা, তার ইজ্জত আবরু লুন্ঠন করা কিংবা তাকে হত্যা করা সম্পূর্ণ অবৈধ হারাম ও জুলুম।

قد جعل الله لكل شيء قدرا

'প্রতিটি বস্তুর জন্য আল্লাহ পাক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ও স্তর নির্ধারণ করে দিয়েছেন।' কোন মুসলমানের জন্য সে সীমা লংঘন করা বৈধ নয়। সহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটা ও কাব্যের রস উপভোগ কর, কিন্তু অতিরঞ্জন করোনা, কোরআন শরীফকেও যদি কেউ পূজা করা শুরু করে উপাস্য জ্ঞানে তাকে সিজদা করে তবে সে মুশরিক হয়ে যাবে, কেননা ইবাদত শুধু আল্লাহরই প্রাপ্য, তবে সব ভাষাকে স্ব-স্ব মর্যাদায় রেখে মাতৃভাষাকে ভালোবাসা, স্বীয় অবদানে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলা শুধু প্রশংসনীয়ই নয় অপরিহার্যও বটে।

বন্ধুগণ, পরদেশী মুসাফির ভাইয়ের একথা গুলি যদি স্মরণ থাকে তবে একদিন না একদিন তার গুরুত্ব আপনারা অবশ্যই উপলব্ধি করবেন—

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله ○ إن الله بصير بالعباد

"তোমাদেরকে যে কথা গুলো বলছি তা অদূর ভবিষ্যতে তোমরা স্মরণ করবে; আমি আমার যাবতীয় বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তার বান্দাদের সব কিছু দেখেন।"

আকাশের ফিরিশতারা শুনে রাখুক এবং "কিরামান কাতিবীন" লিখে রাখুক যে, প্রতিবেশী ভাইদের প্রতি আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করেছি। আমি আবার বলছি—শেষ বারের মত বলছি, তোমরা এদেশের মাটিতে বাঁচতে চাও; ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চাও; তবে এটাই হচ্ছে তার বিকল্প উপায়। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন।

ইসলামের সাথেই এদেশের ভাগ্য জড়িত

[১৬ই মার্চ ১৯৮৪ রোজ শুক্রবার ঢাকা জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে প্রদত্ত খোৎবা]

হামদ ও ছালাতের পর।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ○ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ط كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ○

"তোমরা সম্মিলিত ভাবে আল্লাহ্র রজ্জু আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে আর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করেছের। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরেছো। তোমরা অগ্নি কুন্ডের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হয়ে ছিলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিদর্শন সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেন যাতে তোমরা সরল পথ পেতে পারো। [আল-ইমরান—১০৩]

প্রিয় ভাই সকল! আল্লাহ পাকের হাজার শোকর যে, তিনি এক জায়গায় একত্রিতভাবে এতো অধিক সংখ্যক মুসলমানের মুখ দর্শনের সৌভাগ্য দান করেছেন।

এমন এক সময় ছিলো যখন একজন মুসলমানের সাক্ষাৎ লাভের জন্য চোখ তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকতো। দুনিয়াতে মুসলমানের সংখ্যা এত অল্প

ছিল যে, হাতের আঙ্গুলে তা গনা যেতো। আর আজ আল্লাহ্‌র রহমতে পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহর সংখ্যা শত কোটিও ছাড়িয়ে গেছে। এই মোবারক মুহূর্তে দুনিয়ার কত লক্ষ মসজিদে আল্লাহ্‌র মুমিন বান্দাগণ আল্লাহ্‌র সামনে সিজদাবনত হতে উপস্থিত হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

আমাদের প্রত্যেকের এ অনুভূতি থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে কত বড় নিয়ামত দান করেছেন। বস্তুতঃ কালেমার সৌভাগ্য এবং ঈমান ও তাওহীদের সৌভাগ্যই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য। পৃথিবীর যাবতীয় ধন-দৌলত হাসি মুখে লুটিয়ে দেওয়া যেতে পারে এ সৌভাগ্য লাভের মোকাবেলায়। ঈমান ও তাওহীদের মূল্য এমনই যে, কোন মুসলমানকে যদি বলা হয় যে, তোমাকে দশ দুনিয়ার সম্পদ দেওয়া হবে যদি তুমি কালেমার বিশ্বাস প্রত্যাহার করে নাও তবে সেই মুহূর্তে তার মুখ থেকে বুক ফাটা চিৎকার বেরিয়ে আসবে—হে দ্বীন দুনিয়ার মালিক কি অপরাধ করেছি যে, শয়তানের লোলুপ দৃষ্টি আমার ঈমানের উপর পড়লো ?

তুরস্কের অভিশাপ কামাল আতাতুর্কের সময় আরবীতে আযান দেয়ার ব্যাপারে সরকারী বিধি নিষেধ জারী হয়েছিলো। বাধ্যতামূলক ভাবে তুর্কী ভাষায় আযান দিতে হতো, তুর্কী মুসলমানগণ আরবী ভাষায় অযান শোনার জন্য ছটফট করছিলো। তুর্কীরা আমাকে জনিয়েছে যে, সরকারী বিধি নিষেধ প্রত্যাহারের পর প্রথম যখন আরবী ভাষায় আযান দেওয়া হলো, মসজিদের মিনারে যখন ধ্বনিত হলো الله اكبر আরবী আযানের সেই সুমধুর সুর মূর্ছনায় গোটা তুর্কী জাতি এমনই আত্মহারা হয়ে পাড়েছিল যে, রাস্তায় নেমে এসে তারা উল্লাস নৃত্য শুরু করে দিয়েছিলো। হাজার হাজার দুম্বা এই খুশীতে জবাই করে ফেলেছিলো যে, মৃত্যুর পূর্বে মদীনার ভাষায় মদীনার আযান শোনার সৌভাগ্য হলো। এখন আমরা নবীজীর সামনে গিয়ে উজ্জ্বল মুখ নিয়ে দাঁড়তে পারবো। রাস্তায় রাস্তায় জনতার ঢল দেখে যে কোন পর্যটকের এধারনা হতে পারতো যে, বুঝিবা তুর্কীরা সদ্য স্বাধীনতা লাভ করেছে।

কনষ্টান্টিনোপলের বৃহত্তম মসজিদ জামে সুলায়মানীতে আমি সালাত আদায় করেছি, অন্যান্য মসজিদেও আমি গিয়েছি। ছালাম ফিরিয়েই তুর্কীরা আরবী ভাষায় যে কথাটি বলে তা এই—وعلى نعمة الاسلام الحمد لله "আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের নিয়ামত দান করেছেন এখন তার প্রশংসা ও শোকর" আমি বলছিনা যে, আপনারাও তুর্কীদের অনুকরণ শুরু করুণ, আলেমগণ কিছুতেই এতে অনুমোদন করবেননা। আমাদের।

তাই বলা উচিত যা আল্লাহ্‌র রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন। কিন্তু ইসলামের প্রতি তুর্কীদের এই সুকৃতজ্ঞ অনুভূতিকেও আমি শ্রদ্ধা না করে পারি না।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হও। ইসলামকে নিয়ে গর্ব করতে শেখো। যতদিন তোমরা ইসলামকে দুনিয়ার সকল সম্পদের উপর প্রাধান্য দেবে। ইসলামের মোকাবিলায় সর্বস্ব বিসর্জন দিতে শিখবে ততদিন পর্যন্ত তোমাদের ও তোমাদের দেশের উপর আসমানের কল্যাণ ধারা বর্ষণ অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন-

واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها ○

"তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ করোঃ যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরেছো। তোমরা অগ্নিকুন্ডের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছিলে। তখন তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন।"

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করো। তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে। একে অন্যের খুন পিয়াসী ছিলে। فالف بين قلوبكم আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। হৃদয়ে হৃদয়ে ভালোবাসার ফুল ফুটিয়েছেন। فاصبحتم بنعمته اخوانا ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। বল কোথায় এভাবে বড়-ছোট আমীর-গরীব, রাষ্ট্র প্রধান ও সাধারণ নাগরিক এক সাথে এক কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শামিল হতে পারে। আল্লাহ্‌র ঘরে আসার পর মাহমুদ-আয়াযের সকল ব্যবধানই মুছে যায়। এখানে সাদা কালো সবাই ভাই ভাই। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে যত বিরোধ লড়াই ছিলো

ইতিহাসের পাতায় আজ তার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ নেই। ভাষা ও বর্ণের দ্বন্দ্ব, গোত্র ও সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব, ধনী দরিদ্রের শ্রেণী দ্বন্দ্ব, ভূস্বামী ও ভূমিহীনদের দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে গোটা-পৃথিবী ছিলো দ্বন্দ্ব-মুখর। মানুষের হাত লাল হতো মানুষেরই খুনে। মানুষের আহাজারি ও আর্তনাদ চাপা পড়ে যেতো মানুষের নারকীয় উল্লাস ও অট্টহাসিতে

فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হলে। এরপর আল্লাহ এরশাদ করেছেনঃ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا

حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا জাহান্নামের দ্বার প্রান্তে তোমরা

উপনীত হয়েছিলে। আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। যদি আল্লাহর দীন অবতীর্ণ না হতো, যদি নবী রসূলগণ দুনিয়াতে প্রেরিত না হতেন, যদি আল্লাহর শেষ নবীর শুভাগমন না হতো তবে জাহান্নামের অতল গহবরে নিক্ষিপ্ত হতে আর কিছুই তো অবশিষ্ট ছিল না। দেখুন, পৃথিবীর কত বড় বড় দার্শনিক, চিন্তাবিদ, পন্ডিত ও রাষ্ট্রনায়ক আজ ঈমান ও তাওহীদের মতো সহজবোধ্য ও সাধারণ জ্ঞান (Common Sense) টুকু থেকে বঞ্চিত। অথচ আমার আপনার মতো সাধারণ লোককে আল্লাহ ঈমানের দৌলত দান করেছেন। কোন দর্শন. কোন আন্দোলন এবং কোন শ্লোগানই যেন এ জাতির সামনে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে না দাঁড়াতে পারে। বোখারী শরীফের হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, "কেউ যদি তিনটি বিষয়ের অধিকারী হতে পারে তবে বুঝতে হবে যে, তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রথমতঃ আল্লাহ ও আল্লার রসূলই তার কাছে পৃথিবীর অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশী প্রিয় হবে। দ্বিতীয়তঃ কুফরী-জীবনে প্রত্যাবর্তন করা তার কাছে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়েও অধিক কষ্টদায়ক মনে হবে। এটা প্রকৃত পক্ষে নবী রসূলদেরই উত্তরাধিকার। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ

لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ

آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ

لَهُ مُسْلِمُونَ ○

"ইয়াকুবের মৃত্যুর সময় তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে, যখন তিনি তার সন্তানদের জিজ্ঞাসা করছিলেন। "আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে ?" তখন তারা উত্তরে বললো—আপনার; ইব্রাহীমের, ইসমাঈলের এবং ইসহাকের ইলাহের ইবাদত করবো। যিনি এক অদ্বিতীয়।"

[বাকারাঃ ১৩৩]

মৃত্যুর সময় ইয়াকুব তাঁর সন্তানদের ডেকে বৈষয়িক কোন কথা বলেননি। বলেননি যে, অমুক স্থানে আমার অত সম্পদ গচ্ছিত আছে, অমুকের কাছে অত পাওনা আছে, তোমরা তা সংগ্রহ করে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিও। এটা বলা অস্বাভাবিক কিংবা অন্যায় হতো না। তা না করে সন্তানদের ডেকে তিনি বললেনঃ হে প্রাণধিক পুত্রগণ! আমাকে

একটা কথাই শুধু বলো—مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي আমার এ চোখ দুটো

বন্ধ হওয়ার পর তোমরা কার ইবাদত করবে ? তোমাদের ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে না পারলে কবরেও আমার শান্তি হবে না। তারা উত্তরে বললো আব্বাজান! আপনি এতটা পেরেশান কেন ? ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক; ও ইয়াকুব আলাইহিমুস্‌সলামের পবিত্র রক্ত আমাদের শিরায় প্রবাহিত। আমরা মরে যাওয়া পছন্দ করবো কিন্তু মুহূর্তের জন্য শিরকের পাপ-

স্পর্শ সহ্য করবো না। نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ—আমৃত্যু আমার

আপনার ও আপনার পূর্ব পুরুষের মাবুদ আল্লাহর অনুগত থাকবো। সন্তানদের এ উত্তর শুনে তবে তিনি আশ্বস্ত হলেন। এ-ই হওয়া উচিত প্রতিটি মুসলমানের বৈশিষ্ট্য। নিজের ও পরিজনদের ঈমানের হিফা-জতের জন্য তাকে থাকতে হবে সদা সতর্ক, সদা সন্ত্রস্ত। সন্তান ও পরিজনদের শিক্ষা-দীক্ষা এমনভাবে দিতে হবে যেন তার মৃত্যুর পরও তারা ঈমান ও তাওহীদের প্রতি অবিচল থাকতে পারে, সীরাতুল মুস্তাকীম থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত না হয়। প্রতিটি মুসলমানকেই নিজের ও পরিজনদের ঈমানের ব্যাপারে নিশ্চয়তা (Guarantee) লাভ করা অপরি-

হার্য। ঈমানের সাথে সাথে শিরক ও কুফরীর সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের প্রতিও অন্তরে থাকতে হবে প্রচন্ড ঘৃণা। শিরক ও কুফরীর প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা ছাড়া ঈমান সর্বদা অরক্ষিত। এজন্য কুফরীর প্রতি ঘৃণা পোষণের কথা ঈমানের আগে উল্লেখিত হয়েছে— فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله "যারা তাগূতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে।"

ভাই ও বন্ধুগণ ! আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করুণ। কতবড় দেশ আপনাদেরকে আল্লাহ দান করেছেন। এদেশ সম্পর্কে কুদরতের ফয়সালা এই যে, ইসলামের মাধ্যমেই এদেশ সম্মান ও গৌরব লাভ করবে, কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভ করবে। মসজিদে নববীর মিম্বরের প্রতিনিধিত্ব কারী আপনাদের এ মসজিদের মিম্বরে বসে বলছি, এ দেশের সুখ-শান্তি মর্যাদা ও নিরাপত্তা ইসলামের সাথেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আল্লাহ না করুন, যদি এ দেশ কখনো আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের ব্যাপারে কৃতঘ্ন প্রমাণিত হয়, ইসলামের সাথে তার সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে কিংবা এ দেশের মানুষ আল্লাহর রজ্জুকে ছেড়ে অন্য কোন রজ্জু আঁকড়ে ধরতে চায় তবে এ দেশের ধ্বংস অনিবার্য। কোন পরিকল্পনা ও প্রকল্প এবং বাইরের কোন সাহায্য ও ছত্রছায়াই এ দেশকে আল্লাহ্‌র প্রতিশোধ থেকে রক্ষা করতে পারবেনা।

বন্ধুগণ ! সেই সাথে একথাও মনে রাখবেন মুসলমানদের কাছে আল্লাহ্‌র দাবী এই যে, يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة

"হে ইমানদারগণ ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো। [বাকারাঃ ২০৮] মাথাকে মসজিদে গলিয়ে দিয়ে গোটা দেহ বাইরে রেখে দিলে একথা বলা যাবেনা যে, আপনি মসজিদে প্রবেশ করেছেন। তদ্রূপ আল্লাহ পাকেরও দাবী হলো ; তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো। আকীদা ও বিশ্বাস, ইসলামী আহকাম ও বিধি-বিধান, ইসলামী আইন ও সমাজ ব্যবস্থা এবং ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুন; এক কথায় গোটা 'আল ইসলামের' কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে। একমাত্র তখনই শুধু আল্লাহর দরবারে আপনার ইসলামগ্রহণ স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ করবে। হযরত ইবরাহীমের কাছে যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ এলো اسلم "হে ইব্‌রাহীম পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করো।" তখন সাথে সাথেই তিনি বলে উঠলেন ঃ اسلمت لله رب العالمين "রাব্বুল আ'লামীন আল্লাহ্‌র দরবারে আমি

পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলাম" আপনাকে আমাকেও ইব্‌রাহীমের মিল্লাতভুক্ত হওয়ার সূত্রে পরিপূর্ণ আত্মসম্পর্ণ করতে হবে।

ভাই ও বন্ধুগণ ! আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়াতলে একবার আশ্রয় গ্রহণ করে দেখুন ! আকাশ থেকে নিয়ামত ও প্রাচুর্যের অফুরন্ত ধারা কিভাবে নেমে আসে। ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض "বস্তিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিতো তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বরকত ও প্রাচুর্যের দুয়ার তাদের জন্য খুলে দিতাম।"

[আরাফ ঃ ৯৬]

আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি, ইসলামের সাথে এ দেশের এবং রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এজাতির সম্পর্ক চির অটুট থাকুক। রিযিক, নিয়ামত, বরকত ও প্রাচুর্যের অফুরন্ত ধারা এ জাতির উপর বর্ষিত হোক। সুখ-শান্তি ও স্থিতিশীলতা এখানে বিরাজ করুক। ভাইয়ে ভাইয়ে ভালোবাসা, সম্প্রীতি, আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ বিরাজ করুক।

বুদ্ধি বৃত্তিক স্বনির্ভরতা অর্জন বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব

[১৯ শে মার্চ ১৯৮৪ইং তে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আয়োজিত সমাবেশে দেশের বুদ্ধিজীবী ও গবেষণা কাজে নিয়োজিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রদত্ত ভাষণ।]

উপস্থিত সুধীবৃন্দ !

এই মুহূর্তে আমি অত্যন্ত পুলকিত ও আবেগাপ্লুত। আল্লাহর দরবারে লাখো শোকর যে, আজকের এই মুবারক মজলিসের মাধ্যমে আমার দশ দিনব্যাপী বাংলাদেশের সফরের শুভ পরিসমাপ্তি ঘটছে। সেই সাথে আজকের এই মজলিসে 'খিদমতে খালক' প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।

প্রথমে আমি উপস্থিত লেখক বুদ্ধিজীবীদের খিদমতে অনুমতি হলে বলতে চাই যে, আমার সহকর্মী ও স্বগোত্রীয় বন্ধুদের খিদমতে একটি কথা আরয করতে চাই। সমগোত্রীয় এ জন্য যে, আমিও আপনাদের মতো লেখা-পড়ার সাথে সংশিলষ্ট ব্যক্তি।

আপনাদের সামনে একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন, কিংবা একটি ধাঁধাঁ তুলে ধরতে চাই। আপনারা অবশ্যই জানেন; হিজরী সাত শতকের মাঝামাঝি সময়ে একটি নতুন শক্তিরূপে তাতারীদের অভ্যুদয় ঘটেছিল। বর্বর তাতারীরা মধ্য এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাস করতো। তাদের চিন্তা, বুদ্ধি বৃত্তি, রাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিমন্ডল ছিলো খুবই সংকীর্ণ। হাজার বছর ধরে বদ্ধ জলাশয়ের মাছের মতো বিছিন্ন জীবনে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। তারপর এক সময় আল্লার কুদরতের প্রকাশ ঘটলো। বর্বর তাতার জাতি তাদেয় সংকীর্ণ পরিবেষ্টন ভেঙ্গেচুরে এক দুর্বার গতিতে বেরিয়ে এলো। তখনকার ইসলামী সালতানাত বা মুসলিম সম্রাজ্য ছিলো সুদূর বিস্তুত। বিশেষতঃ তুর্কিস্তানের খাওয়ারিজম শাহের সালতানাত ছিল তৎকালীন আলমে ইসলামীর বিশালতম সালতানাত। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্‌র সামাজিক ও নৈতিক ভিত্তি মূলে পচন ধরে গিয়েছিলো। সমাজের অধিকাংশ লোক হয়ে পড়েছিলো অপরাধাসক্ত। সম্পদ ও ক্ষমতা এবং বস্তুসভ্যতা ও সংস্কৃতির চোরা পথে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তাদের

মধ্যে। পক্ষান্তরে সভ্যতার আলো বঞ্চিত তাতারীরা ছিলো একটি প্রাণবন্ত জাতি। নবুয়তী পথ নির্দেশনা ও আসমানী শিক্ষার সাথে তাদের কোন পরিচয় ছিলনা সত্য। তবে তাদের জাতীয় চরিত্রে এমন কোন ব্যাধিও ছিলোনা যা তাদের জাতীয় শক্তি ও উদ্যমে অবক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে কিংবা অলস ও বিলাসী জীবনের প্রতি আসক্ত করে তুলতে পারে। এমন একটি প্রাণবন্ত জাতি যখন খাওয়ারিজম সালতানাতের উপর আপতিত হলো তখন খাওয়ারিজম শাহের সুশিক্ষিত বিশাল সেনাবাহীনি সে আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে পারলোনা। মোট কথা, তাতারীদের মুকাবিলা ছিলো এক জরাগ্রস্ত সালতানাত ও অপরাধাসক্ত জাতির সাথে। ফল এই দাঁড়ালো যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমন্বয়ে যে সালতানাত আলমে ইসলামের বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হয়েছিলো তা দেখতে দেখতেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো। খাওয়ারিজম সালতানাতের পতনের পর আলমে ইসলামীতে এমন কোন শক্তি আর অবশিষ্ট ছিলোনা যারা তাতারীদের কিছুক্ষণের জন্য হলেও রুখে দাঁড়াতে পারে। মুসলিম উম্মাহ তখন এমন হীনবল ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো যে, তাতারীদের মনে করা হতো আসমানী মুসীবত, এবং প্রায় প্রবাদ বাক্যের মতো একথা ছড়িয়ে পড়েছিলো যে,

اذا قيل لك ان التتر قد انهزموا فلا تصدقه

সব কিছুই বিশ্বাস করতে পারো। তবে কেউ যদি বলে যে তাতারীরা মার খেয়েছে তবে সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করোনা। কেননা আকাশ ভেঙ্গে পড়া সম্ভব কিন্তু তাতারীদের পরাজিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই ছিল সমসাময়িক আলমে ইসলামীর বাস্তব চিত্র।

বন্ধুগণ! হয়ত কিছুটা বিরক্তি বোধ করছেন যে, আলেম ও বিজ্ঞজনদের এই ভাব গম্ভীর মজলিসে অসভ্য তাতারীদের প্রসঙ্গ টেনে আনার কি প্রয়োজন ছিলো? বন্ধুগণ! একটি বিশেষ প্রয়োজনেই তাতারীদের আমি এখানে টেনে এনেছি এবং মুসলমান বানিয়েই এনেছি। অনুগ্রহ করে আমাকে একটুখানি সময় দিন।

ইতিহাসের এক বড় জিজ্ঞাসা এই যে, যে তাতারী জাতি এক সময় গোটা আলমে ইসলামীকে পিষে মেরেছিলো, সুদীর্ঘ ছয়শ বছরের ঐতিহ্যবাহী, হারুনুর রশীদের বাগদাদ যে তাতারীদের বর্বরতায় শ্মশানে পরিণত হয়েছিলো, দজলা নদীর পানি একবার মুসলমানদের রক্তে লাল আর একবার লক্ষ - লক্ষ গ্রন্থের কালিতে নীল হয়ে গিয়েছিলো, সেই নিষ্ঠুর জাতি কোন আশ্চর্য উপায়ে আকস্মাৎ জাতীয়ভাবে ইসলাম গ্রহণ

করে বসলো। এক সময় আলমে ইসলামীর জন্য যারা ছিলো মূর্তিমান অভিশাপ, পরবর্তী কালে তারাই হলো ইসলামের মুহাফিজ রক্ষক। কি ভাবে এটা সম্ভব হলো? কি কি কার্যকারণ এর পিছনে সক্রিয় ছিলো? কোন ঊর্ধ্ব শক্তি ইসলামের সামনে এমন একটি নিষ্ঠুর ও শক্তিমদ-মত্ত জাতির মাথা নত করে দিয়েছিলো? ইতিহাসের এটা একটা প্রশ্ন; যার বস্তুনিষ্ঠ উত্তর আমাদের খুঁজে পেতে হবে।

এ অভাবনীয় ঐতিহাসিক ঘটনার পিছনে মূল কারণ ছিলো দু'টি। প্রথমতঃ ইসলামী উম্মাহ্‌র অলী ও আধ্যাত্মিক বুযুর্গগণ তাতার জাতির প্রতি তাদের তাওয়াজ্জুহ ও মনযোগ নিবদ্ধ করলেন। আল্লাহ্‌র দরবারে তারা প্রার্থনার হাত তুললেন। শেষ রাতে ব্যথিত হৃদয়ের আহাজারিতে আল্লাহর আরশ কাঁপিয়ে দিলেন। হিকমত ও মহব্বত এবং প্রেম ও প্রজ্ঞার সাথে ইসলামের দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। আহলুল্লাহ ও আল্লাহর ওলীদের উপরোক্ত কর্ম তৎপরতার একটি দৃষ্টান্ত জনৈক ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক তাঁর The preaching of Islam নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আমি আমার "তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত" নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে তা বিবৃত করেছি। অন্য একটি কার্যকারণও এর পিছনে সক্রিয় ছিলো। সেই কার্যকারণটির সাথেই আজকের মজলিসের সম্পর্ক আর এজন্যই শুধু এ মজলিসে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি।

শক্তির সব কয়টি উপায়-উপকরণই তাতারীদের কাছে মজুদ ছিলো। সামরিক শক্তি তথা মার্শাল স্পিরিটের কোন কমতি ছিলনা। শৌর্য-বীর্য ও রণকৌশলেরও অভাব ছিলনা। কষ্ট সহিষ্ণুতা ও সহজ সরল, বিলাসহীন জীবনেও তারা অভ্যস্ত ছিল পুরোমাত্রায়। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তাদের দৈন্য ছিল চরম। কোন লিটারেচার বা সাহিত্য সম্ভার ছিলনা তাদের কাছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও কোন ধারণা ছিলো না তাদের। ছিলোনা কোন উন্নত আইন ব্যবস্থা। যাযাবর জাতির মত গুটি কতেক উদ্ভট আইন-কানুন ছিলো তাদের সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ। এমন কি যে ভাষায় তারা কথা বলতো সে ভাষায় কোন হস্তাক্ষর পর্যন্ত ছিলোনা তাদের কাছে। এক কথায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উদার উপহারে সমৃদ্ধ মুসলিম ভূখণ্ডের উপর যখন তাতারীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তারা একেবারেই শূন্যহস্ত ছিলো। তাদের কাছে না ছিলো ভাষা ও সাহিত্য, না ছিলো সভ্যতা সংস্কৃতি আর না ছিলো জ্ঞান বিজ্ঞানের নূন্যতম অনুশীলন। মুসলিম লেখক, সাহিত্যিক' বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কগণ এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। তারা তাদেরকে

সাহিত্য দিলেন, কাব্য দিলেন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করালেন, আর শিখালেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন। এভাবে গোটা তাতার জাতির ভেতর মুসলমানদের বুদ্ধি বৃত্তিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলো। ফলে ধীরে ধীরে গোটা জাতি ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিলো। অর্থাৎ একদিকে আল্লাহ্‌র ওলী ও প্রিয় বান্দাগণ প্রেম ও ভালোবাসা এবং ইখলাস ও নিঃস্বার্থতা দিয়ে তাতার জাতির হৃদয় জয় করলেন। অন্যদিকে মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও চিন্তা নায়কগণ তাদের মস্তিষ্ক জয় করে নিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়ালো যে, তলোয়ার কিংবা অস্ত্রের ধারই কোন জাতির উপর, কোন জাতির জন্য বিজয় লাভের একমাত্র পথ নয়। সংস্কৃতিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক প্রাধান্য লাভের মাধ্যমেও একটি জাতিকে অতি সহজেই গোলাম বানানো যেতে পারে। আর রাজনৈতিক গোলামীর চেয়ে বুদ্ধি বৃত্তিক গোলাম, কোন অংশেই কম নয়।

আমি আপনাদেরকে একথাই বলতে চাই যে, সংস্কৃতিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক ক্ষেত্রে যে জাতি অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত সে জাতির অস্তিত্ব সর্বদাই বিপদ ও হুমকির সম্মুখীন। বিজাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে যারা নিজেদের চিন্তার খোরাক কিংবা সাহিত্যের মাল-মশলা সংগ্রহ করে বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে দেওলিয়া জাতি কোন দিন সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারে না। নিজেদের আদর্শ ও মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে উপরোক্ত জাতির আদর্শ ও মূল্যবোধই তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ করবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাদের ধর্মমতও গ্রহণ করে বসবে। মানব জাতির ইতিহাসে এমন উত্থান-পতনের ভূরি ভূরি নযীর রয়েছে।

আপনাদের খিদমতে আমি আরো আরয করতে চাই যে, আল্লাহ পাক আপনাদেরকে দেওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করেন নি। নয় দশদিনের এ সংক্ষিপ্ত সফরে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ভ্রমণকারী একজন সচেতন পর্যটকের দৃষ্টি নিয়ে এ জাতিকে আমি যতটুকু বুঝেছি তাতে আমার এ প্রতীতি জন্মেছে যে, মেধা ও বুদ্ধিমত্তা, সরলতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং প্রেম ও হৃদয়ের উষ্ণতার দিক থেকে এ জাতি পৃথিবীর অন্য কোন জাতির চেয়ে পিছিয়ে নেই। এ জাতির মেধা ও বুদ্ধিমত্তা যেমন স্বচ্ছ প্রেম ও ভালোবাসাও তেমনি গভীর, নিখাদ। কিন্তু সেই সাথে আমি এদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, যদি সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বুদ্ধি বৃত্তির ক্ষেত্রে আপনারা কোন জাতি কিংবা শ্রেণীর প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন তবে অত্যন্ত দুঃখের সাথেই আমাকে এ কথা বলতে হবে যে, জাতি হিসাবে যে কোন

মুহূর্তে আপনাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যেতে পারে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথে সংস্কৃতিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক স্বাধীনতা অর্জনও অপরিহার্য। এ ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতাও অর্থহীন হয়ে পড়ে। নিজেদের নেতৃত্ব নিজেদের হাতেই থাকা উচিত। আমি অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় বলছি। অন্য কোন দেশের; এমন কি আপনাদেরই স্বভাষী, যারা কোন প্রতিবেশী দেশে বাস করে তাদেরও বুদ্ধি বৃত্তিক ও মানসিক গোলামী কয়া উচিত নয়। সর্বক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা সমুন্নত রাখুন। আর্থিক মাশুলের মত বুদ্ধি বৃত্তিক মাশুলও মানুষকে আদায় করতে হয়। আর তা আর্থিক মাশুলের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতিকর ও বেদনাময়। অতএব নিজেদের বুদ্ধি বৃত্তিক মাশুল নিজেদের দেশেই আদায় করুন। নিকটতম দেশ কিংবা শহরেও তা পাচার হতে দেয়া উচিত নয়। এ দেশের অর্থ-সম্পদ বাইরে পাচার হয়ে যাওয়া যেমন ক্ষতিকর; বাইরের কোন সমাজ থেকে চিন্তা ও ধ্যান ধারণা পাচার হয়ে আসাও তেমনি ক্ষতিকর। হাঁ একমাত্র ইসলামের প্রাণকেন্দ্র, ওয়াহীর অবতরণ ক্ষেত্র হারামাইন শরীফাইন থেকে ভাব, চিন্তা ও পথ নির্দেশনা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রয়োজন হলে উপমহাদেশীয় আধ্যাত্মিক ও শিক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকেও চিন্তা ও বুদ্ধি বৃত্তিক পাথেয় সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু চিন্তা, বিশ্বাস এবং ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রে যাদের সাথে মৌলিক বিরোধ রয়েছে তাদের প্রভাব গ্রহণ, সাহিত্য, কাব্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাদের পদাংক অনুসরণ খুবই মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনবে।

দু'টি পথে তাতারী জাতি ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক পথে, দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধি বৃত্তিক পথে। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানগণই ছিলো তখন শীর্ষ জাতি। মৌলিক গবেষণা ও আবিস্কারের ক্ষেত্রে তারা ছিলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আজকের ইউরোপ তখন ছিলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। একাডেমিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক নেতৃত্ব তখন এককভাবে মুসলমানদের হাতেই ছিলো। সামরিক ও রাজনৈতিক বিচারে যদিও তারা ছিলো বিজিত, কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তিক ক্ষেত্রে তারাই ছিলো বিজেতা আর তাতারীরা ছিলো বিজিত। ফলে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বিজয়ী জাতিকে মাথা নত করতে হয়েছিলো বিজিত জাতির কাছে। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে আজ আমার সে আশংকাই হচ্ছে। এক হিতাকাংখী ভাই ও কল্যাণকামী বন্ধু হিসাবে আপনাদের জন্য আমার পরামর্শ এই যে, নিজেদের সাহিত্য ও কাব্য নিজেরাই

গড়ে তুলুন। সংস্কৃতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে নিজস্ব স্টাইল ও রীতি গ্রহণ করুণ এবং তার উৎকর্ষ সাধনে একনিষ্ঠ ও নিবেদিত হোন। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি। জাতীয় কবি হিসাবে কাজী নজরুল ইসলামকেই আপনাদের তুলে ধরা উচিত। নজরুলের কাব্য ও সাহিত্য কর্ম বিশ্ব-সাহিত্য সভায় তুলে ধরুন এবং নজরুলকে নিয়ে গর্ব করুন। আপনাদের নিজেদের ভিতরেও অনেক প্রতিভা লুকিয়ে আছে সে সব প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ তৈরী করুন। নিজেদের ভিতর থেকেই স্টাইলের জন্ম দিন। নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করুন। মনে রাখবেন; এটা খুবই সংবেদনশীল ক্ষেত্র। এখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। সংস্কৃতির জগতে আপনাদেরকে পূর্ণ স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। ইতিহাসের একজন সাধারণ ছাত্র হিসাবে বলছি, এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না। আর ইতিহাসের প্রতিশোধ বড় নির্মম।

যে কারণে আপনাদের দেশ থেকে আমি আনন্দ ও আশাবাদ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি তা হচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপস্থিতি। বস্তুতঃপক্ষে এটা হচ্ছে সঠিক সময়ে, সঠিক দিকে একটি সঠিক পদক্ষেপ। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতির জন্য নিজস্ব একাডেমী থাকা একান্তই অপরিহার্য। চিন্তা ও বুদ্ধি বৃত্তির উৎস স্বদেশের মাটিতে এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, দেশের বাইরে থাকাটা স্বাধীন জাতির জন্য আদৌ মর্যাদাজনক ও কল্যাণকর নয়। হিন্দুস্থান ও মিশরের মুসলমানগণ পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার এবং ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ শুধু এই যে, তাদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার উৎস ছিলো ইউরোপে, কেম্ব্রিজে, অক্সফোর্ডে কিংবা আমেরিকার বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহে। বাইরে থেকে আপনারা যা খুশি আমদানী করুন। খাদ্য আমদানী করুন, বৈজ্ঞানিক উপকরণ, কলকব্জা ও কারিগরিবিদ্যা আমদানি করুন, কিন্তু সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন ও আদর্শ আমদানি করা বন্ধ করুন। বাংলাদেশের মত স্বাধীনচেতা জাতির জন্য নিজস্ব স্টাইল থাকা উচিত।

সর্বক্ষেত্রে নিজস্ব স্টাইল ও রীতির প্রচলন হওয়া উচিত। কলকাতা ও পশ্চিম বঙ্গ আপনাদের অনুসরণ করুক। আপনারা তাদের অনুকরণ করতে যাবেন না। সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে আপনারা ইমাম হোন। সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের অধিকারী কোন স্বাধীন জাতির জন্য মুকতাদী হওয়া গর্বের কথা নয়। আপনাদের রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য, নিজস্ব ইতিহাস।

আপনাদের পক্ষে অন্য কোন জাতির দুয়ারে—আয়তনে ও সংখ্যায় তারা যত বড়ই হোক—ধর্ণা দেয়া শোভনীয় নয়। প্রথম কাতারে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্থান আপনাদের জন্য নয়। শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প-কাব্য, এক কথায় বুদ্ধি বৃত্তির ক্ষেত্রে যতদিন আপনারা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন না করবেন, নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থান মজবুত করতে সক্ষম না হবেন ততদিন আশ্বস্ত হওয়ার কোন উপায় নেই। যতদিন আমাদের কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনগুলোতে আমাদের সামাজিক ও জাতীয় তথা ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের ভূমিকা পালনের জন্য এগিয়ে না আসবে ; সমাজের আশা-আকাংখা এবং তার হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করার যোগ্যতা অর্জন না করবে ততদিন সেগুলোর উপরও ভরসা করার উপায় নেই। একটি স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় আশা-আকাংখা ও মূল্যবোধের সাথে অবশ্যই সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

আরেকটি কারণেও আমার মনে আজ আনন্দ ও আশাবাদের সঞ্চার হয়েছে। তা এইযে, বিলম্বে হলেও খিদমতে খালক বা আর্তমানবতার সেবার গুরুত্ব আপনারা অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং সেজন্য বাস্তব মুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। গতকাল সোনারগাঁয়ে গিয়েছিলাম। সেখানকার সেবা, কার্যক্রম ও যাবতীয় ব্যবস্থা অবলোকন করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। স্টাফ ও স্থানীয় লোকজনদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমি আলাপ করেছি। গড়ে প্রতিদিন কতজন রুগী আসে, কতজন রুগীকে ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়, কি পরিমাণ ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সত্যি এটা আল্লাহর বিরাট মেহেরবাণী। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল ক্ষেত্রের দিকে বিলম্বে হলেও আপনারা মনযোগ দিয়েছেন ; যা এতোদিন খৃষ্টান মিশনারীদের একচেটিয়া ময়দান মনে করা হতো। বস্তুতঃ আর্তমানবতা সেবার ছদ্মাবরণেই তারা এদেশের সাধারণ মানুষের সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সর্বত্র আজ এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, মিশনারী হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো অন্যান্য হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রের তুলনায় অধিক উন্নত ও সেবাধর্মী। যেহেতু তাদের মধ্যে মিশনারী মনোভাব থাকে সেহেতু চিকিৎসা প্রার্থীদের সাথে তারা অত্যন্ত কোমল ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করে থাকে। ফল এই দাঁড়ায় যে, মানুষ সেখানে শারীরিক সুস্থতা লাভ করলেও তার আত্মা হয়ে পড়ে অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত। অন্তত এ ধারণা নিয়ে তাকে ফিরে

আসতে হয় যে, আমাদের চেয়ে এরা অনেক ভালো লোক। এদের মধ্যে মানবতা বোধ আছে। আছে সহানুভূতিপূর্ণ কোমলহৃদয়। এটাও এক ধরণের রোগ। একটি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে আরো মারাত্মক ও ক্ষতিকর আরেকটি রোগ নিয়ে সে বাড়িতে ফিরে আসে। তাই আমি মনে করি যে, এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো আর্তমানবতার সেবায় গোটা জাতির আত্মনিয়োগ করা। খিদমতে খালকের ইসলামী আদর্শ সমাজের বুকে পুনরুজ্জীবিত করা। যাতে মানুষ নিজের ঈমান ও বিশ্বাসের হিফাজত করে সহজ উপায়ে সঠিক চিকিৎসা কিংবা অন্তত পক্ষে সহৃদয় পরামর্শ লাভ করতে পারে। এই মহান প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারে আমি ও আমার সফর সঙ্গীরা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

শুধু এ কথাই আমি আপনাদের বলবো। প্রথমতঃ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি লাভই যেন হয় আপনাদের যাবতীয় উদ্যোগ আয়োজন ও কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্য। এ বিশ্বাস রাখবেন যে, আপনারা ইবাদতে নিয়োজিত আছেন। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, বরং আমার ফতোয়া এই যে, আপনারা ইবাদতে এবং সর্বোত্তম ইবাদতে নিয়োজিত আছেন। কেননা হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে : "দুনিয়াতে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট লাঘব করবে; কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার কষ্ট লাঘব করে দিবেন।" আরো ইরশাদ হয়েছে : "আল্লাহ পাক বান্দার সাহায্যরত থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যরত থাকে।" হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে : "কিয়ামতে আল্লাহ পাক একদল লোককে লক্ষ্য করে বলবেন; আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসোনি।" তারা বলবে : হে মহামহিম আল্লাহ ! আপনি কিভাবে অসুস্থ হতে পারেন ? ইরশাদ হবে : আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। যদি তাকে দেখতে যেতে তবে আমাকেও সেখানে দেখতে পেতে।" বলুন এর চেয়ে বড় মর্যাদার বিষয় আর কি হতে পারে !

দ্বিতীয়তঃ সেবা ও চিকিৎসার সাথে প্রেম ও সহানুভূতিও যোগ করতে হবে। তবেই এ বিরাট পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করবে। এই দুর্বল মহূর্তে মানুষের হৃদয়ের কোমল মাটিতে ঈমান ও কল্যাণের বীজ বপন করে দিন। ইনশাআল্লাহ, কোন একদিন তা ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠবে। অন্ততঃ পক্ষে এ বিশ্বাস তাদের অন্তরে বদ্ধমূল

করে দিতে হবে যে, আল্লাহই হচ্ছেন শেফাদানকারী। ঔষধ ও চিকিৎসক উপলক্ষ মাত্র। আল্লাহর নির্দেশেই ঔষধ তার ক্রিয়া করে। ঔষধের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। এর পর যখন রুগী শেফা লাভ করবে তখন তার অন্তরে নূর সৃষ্টি হবে। তার বিশ্বাসের ভিত মযবুত হবে।

আপনাদের সকলকে বিশেষ করে সভাপতি সাহেব ও ফাউন্ডেশন কর্মকর্তাদেরকে আমার আন্তরিক মুবারকবাদ। একটি সঠিক ও নির্ভুল ক্ষেত্র আপনারা নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছেন। আপনাদের এ দূরদর্শিতা দেশ ও জাতির জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনবে। এটা শুধু দেশের খিদমত নয় দীনেরও এক বিরাট খিদমত। আল্লাহ পাক এ প্রকল্পটিকে স্থায়িত্ব ও পূর্ণতা দান করুন।

সাথে সাথে আমি আপনাদেরকে একথাও বলবো যে, অমুসলিম ভাইদের সাথেও সমান আচরণ করুন। এ ক্ষেত্রে ধর্ম বিশ্বাসের প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে যে, এরাও আল্লাহর বান্দাহ্, আল্লাহই এদের সৃষ্টি করেছেন। এদের কোনরূপ কষ্ট লাঘব করতে পারলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এবং আমরা উত্তম বিনিময় লাভ করবো। সেবার ক্ষেত্রে মুসলমান্ অমুসলমানের পার্থক্য করা উচিত হবেনা। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে অমুসলিম ভাইকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মোট কথা, আপনার চিকিৎসা সহায়তা নিতে এসে সে যেন কোন রকম দ্বৈত আচরণ অনুভব করতে না পারে। আমাদের বোনেরাও সেবার ময়দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাদের হৃদয়ের স্বভাব কোমলতা এক মূল্যবান সম্পদ। এমন কিছু তারা করতে পারেন যা পুরুষের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এব্যাপারে আমাদের হিন্দুস্থানে এবং এখানেও সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমার বোনেরাও পর্দার পিছনে থেকে আমার কথাগুলো শুনছেন জানতে পেরে আমি আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহপাক তাদেরকে সামজ সেবায় যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করার তাওফীক দান করুণ।

শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ! আরেকটি বিষয় আরয করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আপনাদেরকে মিশর বিজয়ী সাহাবী হযরত আমর ইবন আসের একটি ঐতিহাসিক বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তখনকার দুনিয়ায় মিশরের অবস্থান ছিলো তাহযীব তামাদ্দুন ও সভ্যতার স্বর্ণশিখরে। নীল নদী বিধৌত মিশর ছিলো দুনিয়ার সবচেয়ে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামল ভূখন্ড। এমন একটি সমৃদ্ধ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত দেশ জয় করার পরও কেন জানি হযরত আমর ইবন আস কোন

স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। একজন বিজয়ী সেনাপতির মনে যে স্বাভাবিক পুলক অনুভূত হয় তার লেশ মাত্রও ছিলোনা তাঁর অন্তরে। কেননা তিনি ছিলেন নবীর সান্নিধ্য প্রাপ্ত এক সাহাবী। কুরআনের শিক্ষা এবং নবুয়তের দীক্ষায় তাঁর অন্তর ছিলো আলোক উদ্ভাসিত। তিনি ছিলেন যুগপৎ ঈমানী প্রজ্ঞা এবং সাহাবী সুলভ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। তাই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো সুদূর ভবিষ্যত পানে। বিজয়ী আরব মুসলমানদের ডেকে তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর সেই ঐতিহাসিক বাণী; যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। আরব বিজয়ীদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন—"انتم فی رباط دائم" দেখো! মনে রেখো! মিশরের সবুজ শ্যামল উর্বর মাটি, মিশরের সম্পদ, ভান্ডার ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং এদেশের তাহযীব—তামাদ্দুন তোমাদের মনে যেনো কোন মোহ সৃষ্টি করতে না পারে। এদেশের প্রাকৃতিক রূপ ও জৌলুসে তোমারা যেন আত্ম-বিমোহিত হয়ে পড়না। এখানে তোমাদের সঠিক অবস্থান ও দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বক্ষণ সজাগ থেকো। মনে রেখো "তোমরা এখানে সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত আছো।" এক গুরুত্বপূর্ণ চৌকিতে তোমরা অবস্থান করছো। একথা ভেবে আত্ম প্রসাদ লাভ করোনা যে, তোমরা কিবতীদের উপর বিজয় লাভ করেছো। কিংবা রোম সাম্রাজ্যের শস্যভান্ডার দখল করে নিয়েছো। একথাও মনে করোনা যে, আরব উপদ্বীপ খুব নিকটে। কোন অবস্থাতেই আত্ম প্রতারণার শিকার হয়োনা। "انتم فی رباط دائم" এমন এক নাযুক জায়গায় তোমরা আছো যে, মুহূর্তের অসাবধানতায় তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। প্রতিটি মুহূর্তে তোমাদেরকে সজাগ সতর্ক থাকতে হবে। এক ঐশী বাণীর ধারক, বাহক ও প্রচারক হয়ে তোমরা এদেশে এসেছো। এক মহত্তম চরিত্রের আহবান নিয়ে তোমরা এখানে পদার্পণ করেছো মুহূর্তের গাফিলতি ও দায়িত্ব বিচ্যুতি তোমাদের এ বিজয়কে ধূলি লুন্ঠিত করে দিতে পারে। সেই জীবন, দর্শন থেকে চুলপরিমাণও যদি বিচ্যুত হও, যা তোমরা মদীনার পুণ্য মাটিতে নবুয়তের পবিত্র সাহচর্যে লাভ করেছো তবে তোমাদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হবে এবং মিশরে যারা আজ তোমাদের এ বিজয়কে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগত জানিয়েছে তারাই সেদিন তোমাদের বুকে লক্ষ্য করে তরবারি উঁচিয়ে ধরবে। যদি মনে করে থাকো যে, সম্পদ উপার্জন, বিলাস জীবন যাপন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করতেই তোমরা স্বদেশ ভূমি ছেড়ে মিশরে এসেছ। তবে এদেশবাসী তোমাদের প্রতি বিন্দ মাত্র করুণা করবেনা। একটি প্রাণীও সহী সালামতে ফিরে যেতে পারবেনা।

প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে এক আরব সৈনিক—যিনি কোন ইউনিভার্সিটির স্কলার ছিলেন না—বিজয়ী আরবদের লক্ষ্য করে যা বলেছিলেন তা আজ এই মুহূর্তে ইসলামী বিশ্বের বিশেষতঃ আপনাদের এ দেশের ক্ষেত্রে সমানভাবেপ্রযোজ্য।

বন্ধুগণ! ''আপনাদেরও মনে রাখতে হবে انتم فی رباط انتم তোমরা সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত আছো। মুহূর্তের অসাবধানতা তোমাদের ঈমান, বিশ্বাস ও স্বাধীনতা বিপন্ন করে দিতে পারে।

দাক্ষিণাত্যের উপহার

আরবী ভাষায় বুৎপত্তি লাভের সবচে আবেদনশীল কার্যকারণ এবং এর বিস্ময়কর ফলাফল

[হায়দারাবাদের 'সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব্ ইংলিশ এন্ড ফরেন লেং-গোয়েজেস' (Central Institute of English And Foreign Languages) আয়োজিত উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন গভর্নর নবাব মীর আকবার আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়া এ্যারাবিক সেমিনার'-এর উদ্বোধনী ভাষণ। তাং ১১. অক্টোবর ১৯৮২ খৃঃ]।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ইনস্টিটিউটের আরবী শাখা-প্রধান ডক্টর আবদুল হালীম নাদভী আরবীতে সমাগত বক্তা ও শ্রোতাদের স্বাগতম জানান। তারপর ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ডক্টর রমেশ মোহন সেমিনারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবৃত করেন ইংরেজীতে। লাখনৌ ইউনিভার্সিটির 'রিডার' ডক্টর ই'জায আহ্মাদ ইংরেজীতে মাওলানা (আলী নাদভী)-এর পরিচিতিমূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ সব আনুষ্ঠানিকতার পর মাওলানা নাদভী সেমিনারের উদ্বোধনী ভাষণ দেন।

হাম্দ ও সালাত ঃ

মাননীয় সভাপতি, মহাপরিচালক ও সুধীবৃন্দ।

বক্তব্যের প্রারম্ভেই আমি শ্রোতৃমন্ডলীর কাছে উর্দুতে কথা বলার অনুমতি প্রার্থনা করছি। বক্তৃতার ভাষা হিসাবে আরবীর ন্যায় সুমধুর প্রাঞ্জল ও সুব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা আমার জন্য পরম আনন্দ ও সম্মানের ব্যাপার; বিশেষত সেমিনারের ভাষা যখন আরবী নির্দ্ধারিন করা হয়েছে। কিন্তু হায়দারাবাদের মাটিতে এবং উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ছায়াতলে বসে উর্দু ব্যতীত অন্য কোন ভাষা ব্যবহারে সংকোচ-বোধ হয়। কারণ, উর্দু ভাষার উন্নতিবিধান ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে উর্দুকে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে হায়দারাবাদের অগ্রণী ভূমিকা ও উসমানিয়া ইউনিভার্সিটির অবদান সর্বজন স্বীকৃত। সুতরাং এখানে আমার চিন্তা-ভাবনা ও মনের কথাগুলি প্রকাশ করার দাবী ঐ ভাষায়ই যথার্থভাবে করতে পারে।[১]

---

১. উল্লেখিত কারণ ব্যতিরেকে উর্দুতে বক্তৃতা করার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল, আরবী ভাষায় বক্তৃতা করলে শ্রোতৃমন্ডলী বিশেষত সভাপতি ও মহাপরিচালক মহোদয়ের জন্য বক্তৃতার তরজমা করার প্রয়োজন পড়ত। অথচ তরজমায় মূল বক্তব্যের গতি ও আবেগ স্বভাবতঃই ক্ষুন্ন হয়ে থাকে।

এ মহতী মাহফিলের উদ্বোধনের জন্য মনোনীত করে আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন। এই বিরাট সম্মান গ্রহণ করার কোন অধিকার যদি আমার থেকে থাকে তবে তা কেন সে কথা আল্লামা ইকবাল নিম্নের কবিতাটিতে বলেছেন ঃ

مرا ساز گرچہ ستم رسیدہ زخمہ ہائے عجم رہا
وہ شہید ذوق وفا ہوں میں کہ نوا مری عربی رہی

"আমার 'সারংগি' যদিও আজমের (অনারব) ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ; আমি তো প্রেম-বিশ্বস্ততার বেদীতে উৎসর্গীকৃত। কারণ, আমার বাঁশরিতো আরবীই ছিল।"

বন্ধুবর ডক্টর ই'জায তার পরিচিতি প্রদান পর্বে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, চিন্তাধারা ও মনোভাব প্রকাশের জন্য আরবীকেই আমি মূল মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছি এবং আমার দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে আমার অধিকাংশ রচনাই আরবীতে। পরে তা উর্দু-ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হয়েছে। তাই, আমার এ দাবী অসংগত নয় যে, জন্মসূত্রে আমি অনারব-ভারতীয় হলেও আমার হৃদয়ের ভাষা আরবী।

সুধীবৃন্দ! মাতৃভাষার বাইরে কোন বিদেশী ভাষায় মনযোগ নিবদ্ধ করা, তার পেছনে মেধা ও দক্ষতা ব্যয় করা এবং অধিকাংশ সময় তা আহরণে অতিবাহিত করা বাস্তবিকই একটি স্বভাব-বিরুদ্ধ (Unnatural) ব্যাপার। এ ব্যাপার সংঘটনের জন্য প্রয়োজন যুক্তিযুক্ত এক শক্তিশালী আবেদনের। ফিত্‌রাত্‌ ও স্বভাবগুণেই মানুষ তার মাতৃভাষাকে ভালবাসে ; মাতৃভাষায়ই তার স্বভাবজাত প্রতিভার বিকাশ ও স্ফুরণ ঘটে। বিশ্ব সাহিত্য ও বিশ্ব-ভাষার ইতিহাসের অখন্ডনীয় সাক্ষ্য এটাই যে, ভাষাই মানুষের মেধা-প্রতিভা এবং তার বাস্তবানুগ আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে থাকে। মানুষের প্রেম-প্রীতি, তার বিচ্ছেদ-বেদনা, তার অন্তরের লুক্কায়িত ফল্গুধারা মাতৃভাষার আশায় স্বভাব-জাত গতি ও উদ্দীপনার সাথে প্রস্রবণের রূপ নিয়ে উদ্বেলিত ও নির্ঝ-রিত হতে থাকে। আমার সীমিত অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রেক্ষিতে বলতে পারি-নিজ ভাষা পরিত্যাগ করে বিদেশী ভাষার পোশাকে নিজেকে সাজিয়ে তোলা, এই জন্য স্বীয় মেধা সম্ভাবনাকে ব্যয় করা এবং সে ভাষায় কাব্য ও সাহিত্যের চিরস্মরণীয় অবদান রেখে যাওয়ার মনোভাবের মোট চার ধরনের কারণ হতে পারে। ১. রাজনৈতিক, ২. আর্থ-সামাজিক, ৩. ইলমী ও একাডেমিক এবং ৪. ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক। এই কার্য-

কারণ চতুষ্টয়ের বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতাও রয়েছে। এই পৃথিবীর রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ও সময়ের ক্রিয়ার তো আমরা ভুক্তভোগী ও এর বাস্তব সাক্ষী। ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ হওয়ার পর ভারত বৃটেনের মাঝে একটা রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক যোগ সূত্র স্থাপিত হয়। পৃথিবীতে কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান রাখতে ও প্রতিভার সাক্ষর রাখতে উদ্বুদ্ধ যে কোন উচ্চাভিলাষী ভারতীয় তরুণের জন্য ইংরেজী ভাষায় যোগ্যতা অর্জন ও বুৎপত্তিলাভ করা তখন অতীব জরুরী হয়ে পড়েছিল। এ যুগে এসে উল্লেখিত দু'টি উপকরণ (রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক) একীভূত হয়ে গিয়েছিল, সংঘটিত হয়েছিল তাদের সম্মিলন। (কোন ভাষায় মোটামুটি জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে এখানে আমাদের আলোচনা হচ্ছে না।) এ প্রক্রিয়ার পরিণতি কি হয়ে ছিল ? ভারতের শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতর মেধাগুলি সমকালীন আধুনিক শিক্ষা কেন্দ্র তথা স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটিতে ভর্তি হতে থাকল, এ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ধারা-বাহিকতার জের চলল এক শতাব্দী কাল। সেই রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ইস্যু আমাদের ইল্‌ম ও আদব, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্লাট ফরমে কি পরিমাণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা-ই আজ আমাদের লক্ষ্য করার বিষয়। লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব যে, হিন্দু-মুসলমানদের মাঝে ইংরেজী ভাষার এমন কতক সুলেখক ও সুবক্তা তৈরী হয়ে ছিলেন, যাদের যোগ্যতা ও পারদর্শীতার স্বীকৃতি খোদ ইংরেজী ভাষা-ভাষীরা দিয়েছে এবং তাদের শিক্ষিতজনেরা আগ্রহের সাথে এদের রচনা বক্তৃতা পড়েছেন ও শুনেছেন। কিন্তু ঐ দু'টি উৎসের সমন্বিত শক্তি মিলেও এদেশীয়দের ইংরেজী প্রতিভার এমন উন্নত পর্যায় ও উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করতে পারেনি ; যার ফলে এ'দের বক্তৃতা বিবৃতি থেকে শিক্ষা লাভ করা এবং সাহিত্য সমালোচনা ও কাব্য রচনার রীতি-নীতি সুর, ছন্দ ও বর্ণনা শৈলীতে এ'দের পরামর্শ গ্রহণে ইংরেজ কবি-সাহিত্যিকদের প্রভাবিত করা যেতে পারে। এ দেশীয়দের ইংরেজী দক্ষতা ভাষাভাষী-দের সমকক্ষ বা তাদের ঊর্ধ্বে হওয়ার স্বীকৃতি প্রদানে ইংরেজদের বাধ্য করতে পারেনি। আংগুলে গোনা যায় এমন কয়েক জন মনীষীর ইংরেজী প্রতিভা এবং বিশুদ্ধ ইংরেজী কথনও লিখনের স্বীকৃতি ইংরেজরা দিয়েছে। মুসলমানদের এমন ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ (যার নাম আমাদের অনুষ্ঠানের সভাপতি মহোদয়কেও আনন্দিত করবে, তিনি হলেন মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার, ইংরেজরা তার ইংরেজী জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং রুচিশীল শিক্ষিত ইংরেজ অফিসারগণ তার কমরেড (comrade) পত্রিকা পড়ে তার ভাষা ও ব্যংগ উপভোগ করতেন। তা ছাড়া

আল্লামা আবদুল্লাহ ইয়ুসুফ , আহমাদ শাহ পিটার বুরারী (অল ইন্ডিয়া রেডিও এর প্রতিষ্ঠাতাও এর রূপরেখা নির্মান কারী)—এর ইংরেজীও ভাষা-ভাষীদের স্বীকৃতি লাভ করেছে। খাজা কামালুদ্দীন, আপনাদের (হায়দারাবাদের) ডক্টর সায়্যিদ আবদুল লতীফ, আল্লামা ইকবালও ইংরেজীতে অনর্গল বলতে ও লিখতে সক্ষম ছিলেন। এই হায়দারবাদের স্যার আমীন জংও ইংরেজীতে লেখনী ধরেছেন।[১] কিন্তু ইংরেজরা এঁদের ভাষা ও প্রতিভার স্বীকৃতিতে মস্তকাবনত হবে, তাদের রচনা-প্রবন্ধ পড়ে সুরুচি ও স্বাদে মোহিত হবে, বিমুগ্ধ আগ্রহে তাদের কাব্যরুচি ও সাহিত্যানুভূতি এদের সাহিত্য কর্ম দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ করবে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। অবশ্য এঁদের মাঝে দু' একজন ব্যতিক্রমও রয়েছেন, এঁদের মাঝে শীর্ষে রয়েছেন' ''স্পিরিট অব ইসলাম', (spirit of islam), এর স্বনামধন্য রচয়িতা রাইট অনারেবল সায়্যিদ আমীর আলী। তার প্রখর মেধা, নিরলস সাধনা ও মর্মজ্বালার মানদন্ডে বিদেশী ভাষা-ভিজ্ঞতার যে উচ্চতম আসন তাঁর প্রাপ্য ছিল, সাধারণতঃ কোন ভাষার তরুণ সমাজ বিদেশী ভাষার সে স্তরে উন্নীত হতে সক্ষম হয়না। ইংরেজী শেখা লোকদের মধ্যে কতকতো এমনও ছিল, যারা নিজের ভাষা ভুলে থাকার আত্মপ্রতারণা ও ইংরেজী ভাষার পাখা-পেখম ধার করে ময়ূর সাজার কসরত করেছেন। তাদের আকুতি দেখে ইংরেজ সাহিত্যিক, লেখকগণ চোখ বুঁজে বুকে হাত রেখে (সান্ত্বনা দেওয়ার স্বরে) এতটুকু স্বীকৃতি অবশ্য দিয়েছেন যে, 'হাঁ, কোন কোন ভারতীয় বিশুদ্ধ ও উত্তম ইংরেজী লিখে ফেলতে পারেন।'

তৃতীয় উৎস হল জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং সুরুচি অর্জনের সাধনা। 'প্রাচ্যবিদ মনীষিগণ (ORIENTALISTS) এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এ কথা সন্দেহাতীত (যা আমি বিস্তারিতভাবে আমার সদ্য প্রকাশিত রচনা 'ইসলামিয়াত'-এ আলোচনা করেছি)যে, বহু মুস্তাশ্‌রিক বা 'প্রাচ্যবিদ-পন্ডিত' জ্ঞান আহরণের একনিষ্ঠ উদ্যম ও গবেষণা-অনুসন্ধিৎসার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং স্বীয় নির্বাচিত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য শ্রম ও গবেষণা দক্ষতার প্রমাণ পেশ করেছেন। কোন

১. সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা কালে সকল দক্ষ ইংরেজীবিদ ও সকল লেখক জার্নালিষ্টদের পূর্নাংগ তালিকা প্রদান কঠিন ব্যাপার ছিল। এ তালিকায় ইনডিপেনডেন্ট (indepndent) সম্পাদক মিষ্টার সায়্যিদ হুসাইন এবং বোম্বাই ক্রনিক্যাল' (bomby chronicle) সম্পাদক সায়্যিদ আবদুল্লাহ বেরলভী প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

কোন ক্ষেত্রে তারা এমন বিশেষজ্ঞ সুলভ তীক্ষ্ম মেধার পরিচয় ও ছাপ রেখেছেন যে, প্রাচ্য ও ইসলামী বিশ্বের আলিম ও বিদ্বান সমাজেও তাদের গবেষণালব্দ বিষয় থেকে উপকৃত হয়েছেন। তাদের অনেকেতো শুধু দিনের পর দিন আর মাসের পর মাসের হিসাবে নয়, বরং বছরের পর বছর, ত্রিশ-চল্লিশ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে একটি বিষয়ের গবেষণা অধ্যয়নে ব্যয় করে সে বিষয়ে তাঁর গবেষণা-অধ্যয়নের নির্যাস সুধীজন সমীপে পেশ করেছেন[১]। কিন্তু তাদের (ব্যতিক্রম বাদে) প্রায় সকলেরই অধ্যয়ন তত ব্যাপক ও গভীর নয়। তারা কোন বিষয়কে অধ্যয়নের লক্ষ্যরূপে নির্ণীত করে তাতেই গবেষণা-অধ্যয়ন সীমিত রেখেছেন। (আনুষংগিক বিষয়াবলীর প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন নি,) আরবীর বিভিন্ন শাখা ও ইসলামিয়াতে তাদের দৃষ্টি ব্যাপক, গভীর ও তীক্ষ্ম নয়। আরবী ভাষায়ও (যা ইসলামী গ্রন্থমালার মূল মাধ্যম) তারা পূর্ণাংগ ও স্বনির্ভর দখল অর্জন করতে পারেন নি। তাদের রচনা-লিখনী ও আলিম সুলভ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। বৃটেনের কোন কোন শীর্ষস্থানীয় 'প্রাচ্যবিদ' এর সাথে আলোচনার ফলে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, তারা আরবীতে উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞতার অধিকারী নন এবং আরবীর বহুমুখী চিন্তাধারা ও অনন্য বর্ণনা শৈলীর অধিকারী প্রাচীন কবি সাহিত্যিকবৃন্দ সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতাও সীমিত ও অপ্রতুল।

এখন আমি বিদেশী ভাষায় দক্ষতা ও বুৎপত্তি লাভ করার (বিশেষতঃ আরবীর ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) শেষ উৎসটির প্রতি-মূলতঃ যা প্রথম উৎস—আলোকপাত করতে চাই। এটি হল ধর্মীয়, আত্মিক ও অধ্যাত্মিক, নৈতিক ও (জীবন ধারায় ক্রিয়াশীল) মৌলিক বিধি-বিধান সংক্রান্ত উৎস। বিষয়টির বিশদ বর্ণনা এরূপ—যে দীন ও ধর্ম আরবী ভাষাকে তার দা'ওয়াত ও আহবান প্রচারের এবং তার শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছে, সে দীন ঐ ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে আহরণ করা যেতে পারে না। সে দীনের শিক্ষা-দীক্ষা, তার গূঢ়তত্ত্ব, তার যথার্থ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তার প্রকৃত রূহ ও আত্মার সমঝ-উপলব্ধি ঐ ভাষার সহায়তার উপরেই নির্ভর-

১. মাওলানা নাদভীর অন্যতম আরবী বক্তৃতা যা 'দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়' এ অনুষ্ঠিত 'ইসলাম আওর মুস্তাশরিকীন' শীর্ষক সেমিনারে পঠিত হয়েছিল, তাতে প্রাচ্য পন্ডিতবর্গের সমালোচনার দিক সমূহ এবং তাদের দৃষ্টিভংগী ও গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তমালার পর্যালোচনা রয়েছে। বক্তৃতাটির উর্দু তরজমা 'ইসলামিয়াত আওর মাগরিবী মুস্তাশ্‌রিকীন আওর মুসলমান মুসান্নিফীন' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

শীল। সুতরাং নির্ভেজাল এক উদ্দেশ্য হাসিলের স্বার্থে সে ভাষা এবং তার সাহিত্য সরোবরে অবগাহন করতে হবে, তাতে নিমজ্জিত হয়ে তার রং ও রুচিতে রংগীন ও রুচীবান হয়ে নিজেকে সমর্পিত করতে হবে তার আত্মার হাতে। দেহ ও মন সঁপে দিতে হবে দীনের ভাষার প্রাণের সমীপে।

এ প্রসংগে পারস্য-ইরান উজ্জল দৃষ্টান্ত। ইরান গর্ববোধ করত তার ভাষা ও সাহিত্যের। এ গর্ববোধের অধিকার তার রয়েছে। কেননা, ইরানী (ফার্সী) ভাষা হল সাহিত্য, তাসাউফ ও আধ্যাত্মবাদ, প্রেম-বিরহ, ভাব প্রবণ কল্পনা ও রচনা এবং ভাব প্রকাশের উত্তম উপকরণ সমৃদ্ধ এক ভাণ্ডার। আজও আমরা বিমোহিত ও তন্ময়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ি সা'দী, হাফিয, মাওলানা রুমী, জামী, কুদসী, উরফী, নাজীরীর ন্যায় যুগোত্তীর্ণ সাহিত্য সাধকদের রচনা মাধুর্যে। কিন্তু এ ইরানই যখন আরবী ভাষা আহরণ ও তাতে ব্যুৎপত্তি অর্জনে আকৃষ্ট হল, (বিশেষত দীনী ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে) তখন সে জন্ম দিল মনীষী সীবাওয়ায়হকে। তাঁর রচিত 'আল কিতাব' নাহু (আরবী ব্যকরণ ও ভাষানীতি) শাস্ত্রের প্রামান্য গ্রন্থ, অন্যতম ভিত্তি বরং প্রথম ও প্রধান ভিত্তি-রূপে স্বীকৃত। আরও জন্ম দিল 'দালাইলুল ই'জায' ও 'আসরারুল বালাগাহ' রচয়িতা মনীষী শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীকে—আরবী সাহিত্য ও কাব্যের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয় তথা তার নাড়ী-নক্ষত্র সম্বন্ধে যার সুবিজ্ঞ চিকিৎসক সুলভ অভিজ্ঞান এবং ভাষা সাহিত্যের স্বভাব-প্রকৃতির পরিচিতি ও রুচিবোধ্যতার স্বীকৃতি প্রদানে খোদ আরবী ভাষীরাও মস্তকাবনত। ইরান গর্ব করতে পারে যামাখশারী, সাককাকী, আবু আলী ফারেসী—আর কত নাম উল্লেখ করব এঁদের আরবী দক্ষতা-প্রতিভার! এঁরা এক একজন আরবী ভাষা ও সাহিত্যর ভবনের এক একটি মযবুত স্তম্ভ। আসুন আরবী লুগাত ও অভিধান শাখায়—যা একটি নাযুক ও স্পর্শকাতর বিষয়—এখানে মসনদ অধিকার করে রয়েছে আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদীর ব্যক্তিত্ব। তাঁর গ্রন্থ 'কামুস' ('অভিধান') আজ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাংগন ও ইলমী জগতে সর্বাধিক সমাদৃত ও বহুল প্রচলিত। ইরানকে আরবী ভাষায় দক্ষতা-পারদর্শীতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছিল দীনী, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা। বিগত যুগের মেধাবী ও প্রতিভাবান তরুণ মুসলিম সমাজ এ রহস্য সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল যে, আরবী ভাষায় উস্তাদ ও শিক্ষক সুলভ অভিজ্ঞতা অর্জন ও তার সাথে অন্দর মহলের ঘনিষ্ট আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়ে তোলা ব্যতীত আল-কুরআনের রহস্য-ভান্ডার, হাদীছ শরীফের গুরুত্ব এবং 'উসূলে ফিকাহ' এর নাযুক ও

সুক্ষ্ম জটিল আলোচ্য বিষয়গুলি যথাযথভাবে হৃদয়ংগম করা যেতে পারে না। তাদের এ অবগতি ও উপলব্ধির সুফল রূপে ইরান জন্ম দিয়েছিল যুগশ্রেষ্ঠ ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যাকরণ ও ভাষা-নীতিবিদ, ভাষা ও সাহিত্যবিদ, উদ্ঘাটন প্রতিভা সম্পন্ন অলংকার ও বালাগাতবিদ. অভিধান বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মুফাস্সিরবৃন্দকে, আরব দেশেও যাঁদের তুলনা মেলা ভার। আর তাই শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন—এর ন্যায় গোঁড়া লোকও মুক্ত কণ্ঠে এ স্বীকৃতি প্রদানে বাধ্য হয়েছেন ঃ

ان اكثر حملة العلم من العجم

"ইল্ম ও জ্ঞানের অধিকাংশ ধারক বাহক জন্ম দিয়েছে অনারব—আজম।"

এবার আসুন, আমাদের ভারতবর্ষে। এখানেও মূল উৎস ও উদ্দীপকের কাজ করেছে ঐ অভিন্ন বিষয়। আরব দেশসমূহের সাথে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক সংযোগের বয়স হবে আপনাদের অনেকের বয়সের তুলনায় কম। অথচ এ ভারতই দীনী ইল্ম ও আরবী ভাষা-বিজ্ঞানে এত মহান ও বিশাল গবেষণা ও উদ্ভাবন সমৃদ্ধ অবদান রেখেছে, যার তুলনা খোদ আরব দেশসমূহেও বিরল।

একটু আগেই যে 'কামুস'—এর কথা উল্লেখ করলাম, তার বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যারূপে প্রণীত হয়েছে 'তাজুল উরূস'। প্রণয়ন করেছেন আমাদেরই পড়শী অযোধ্যার কৃতি সন্তান, ভারত গৌরব আল্লামা সাইয়্যিদ মুরতাযা বিলগ্রামী। 'যাবীদী' নামে তাঁর সমধিক পরিচিতি হয়েছে। আর এ নামের কারণে অনেক সুশিক্ষিত লোকও তাঁকে ইয়ামানী মনে করে থাকেন। এ কিতাবের বিশালতা সম্পর্কে শুনুন, পৃথিবীর কোন ভাষায় কোন অভিধান গ্রন্থের ব্যাখ্যা এর চাইতে বিশদ ও বিস্তৃততর লেখা হয়েছে, আমার পরিচিত কোন ভাষা সম্পর্কে এমন কোন তথ্য আমার জানা নেই। গ্রন্থকারের জীবনকালেই তাঁর এ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর কিতাবখানি স্বর্ণ দ্বারা পরিমাপ করা হয়েছিল—(রূপক অর্থে নয়, বাস্তবেই!) সে যুগের বড় বড় রাজা বাদশাহগণ তাঁকে তাঁর দেশে পদার্পনের দা'ওয়াত দিয়ে তাঁর নিকট থেকে 'সনদ' গ্রহণ করেছেন। ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন যে, কায়রোতে তার দরবার জমত, যেন কোন সম্রাটের শাহী দরবার। আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা সাইয়্যিদ মুরতাযাকে অনুপ্রাণিত করেছিল কোন জিনিসটি? তা কি কোন রাজনৈতিক বা আর্থ-সামাজিক বিষয় ছিল? রাজনৈতিক উৎস যাচাই করে দেখুন—তখন গোটা আরব দেশ ছিল তুর্কীর শাসনাধীন। ভারতবর্ষের সাথে তুর্কীদের নিয়মতান্ত্রিক কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখনো। দূতাবাসের প্রচলন তো এই সে দিনের ব্যাপার।

বিদেশে চাকুরী করার প্রথাও তখন চালু ছিল না। তা হলে আরবী ভাষায় এত অধিক অভিজ্ঞতা ও বুৎপত্তি অর্জনে সাইয়িদ মুরতাযাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল কোন বিষয়টি, কি ছিল তার আকর্ষণ—যার ফলে তিনি 'কামুস এর এমন এক ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করে ফেললেন। মূল গ্রন্থ প্রনেতা খোদ আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী তা দেখে যাওয়ার সুযোগ লাভ করলে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দাতিশয্যে ব্যাখ্যাকারের হাতে চুমু খেতেন। এ মনীষীরই অপর একটি অনন্য গ্রন্থ—হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালীর চিরন্তন ও যুগান্তকারী গ্রন্থ 'ইহ্য়াউ উলুমিদ্দীন'-এর অনবদ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ اتحاف السادة المتقين شرح احياء علوم الدين (ইত্হাফুস সাদাহ্ আল মুত্তাকীন—শরহু ইহ্য়াউ 'উলুমিদ্দীন'—মুত্তাকীন মনীষীবর্গ সমীপে ইহ্য়াউ 'উলুমিদ্দীনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)। তাঁর এ গ্রন্থকে নির্দ্বিধায় আখ্যায়িত করা যায় একটি দাইরাতুল মা'আরিফ'—"বিশ্বকোষ" নামে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'পরিভাষা' সম্পর্কিত বিষয়টি একটি কঠিন ও নাযুক বিষয়। এর তুলনা করা যায় সাগর বক্ষে চলমান জাহাজের দিক নির্ণয়ক 'কম্পাসের' সাথে। চুল পরিমাণ সামান্য ব্যবধানের কারণে জাহাজ হতে পারে লক্ষ্যচ্যুত; হারিয়ে ফেলতে পারে গন্তব্যের দিশা। অনুরূপ ভাবে যে কোন বিষয়ের যে কোন পরিভাষায় আপনি ভ্রান্তির শিকার হলে আপনি না সে কিতাব বুঝতে সক্ষম হবেন, আর না সমর্থ হবেন তার কোন মাসআলাহ নির্ভুল ভাবে উপস্থাপিত করতে। আরবী ভাষার ইল্ম ও জ্ঞান চর্চার ইতিহাসে এ বিষয়ে লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সংখ্যা দুইটি। এক. দস্তুরুল উলামা; দুই. কাশ্শাফু ইস্তিলাহাতিল ফুনূন, প্রথম খানি মাওলানা আবদুননবী আহমদ নগরীর রচনা। আর দ্বিতীয় গ্রন্থের রচয়িতা হলেন হিজরী দ্বাদশ শতকের সুবিজ্ঞ মনীষী শায়খ মুহাম্মদ আ'লী থানবী। গোটা আরব বিশ্ব আজ পর্যন্ত এ দুই গ্রন্থের প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করতে সক্ষম হয়নি। এ বিষয় প্রাচীন উৎস রূপে বিদ্যমান রয়েছে আল্লামা খাওয়ারাযমীর ক্ষুদ্র কিতাব 'মাফাতীহুল উলুম। আমার এ দাবী আমি আরবের আলিম ও বিদ্বান সমাজে উত্থাপিত করলে তাঁরা এর স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'গারীবুল হাদীছ' (হাদীছের অভিধান) শাস্ত্রে অনেক কিতাব প্রণীত হয়েছে। এ বিষয়ের বৃহৎ ও প্রমান্য গ্রন্থ হল আল্লামা ইবনু আছীরের 'নিহায়াহ্'। কিন্তু এ বিষয়ের যে কিতাবখানি স্বয়ংসম্পূর্ণতা, নির্ভরযোগ্যতা ও ব্যাপক বিস্তৃতির সর্বাধিক অধিকারী তা হলো পাটনার আল্লামা মুহাম্মদ তাহির -এর তাস্নীফ মাজমা'উ বিহারিল আনওয়ার'। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে কায়রোতে অনুষ্ঠিত এক সুধীজন সমাবেশে জামি' আযহারের খ্যাতিমান

আলিম আহমাদ শারবাসী আমার পরিচিতি দিয়েছিলেন এ কথা বলে যে, ইনি সে দেশের বাসিন্দা, যারা এ কথা বলে গৌরব করতে পারে যে, সে দেশে গ্রন্থিত হয়েছে 'মাজমা'উ বিহারিল আনওয়ার-এর ন্যায় মহা গ্রন্থ; যার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারেনা আযহারের বিদ্বান সমাজও।

উলুমে দীনিয়ায় ইসলামের তত্ত্ব ও রহস্য উদ্ভাবন বিষয়ক রচনা গ্রন্থনায় ভারতের অবদানের তুলনা নেই বিশ্ব গ্রন্থাগারে। একমাত্র 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-এর নাম নেওয়াই যথেষ্ট মনে করি। গ্রন্থকার হলেন হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী (রঃ). বিষয় বস্তু হল—দীনের তত্ত্বকথা ও শরীআতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ ছাড়া উল্লেখ করা যায় উসূলে ফিকাহ্-এর কিতাব 'মুসাল্লামুছ ছুবুত'[১] যা দীর্ঘযুগ ধরে আযহার-এর আলিমগণের মনযোগ আকৃষ্ট করে রেখেছিল এবং যার অনেকগুলি ব্যাখ্যা রচিত হয়েছে।

সুধীবৃন্দ! আমার এতক্ষণের নিবেদনের উদ্দেশ্য এ দাবী করা যে, কোন ভাষা শেখা এবং তাতে পাণ্ডিত্য অর্জনের পেছনে কার্যকর ও সর্বাধিক শক্তিশালী অনুপ্রেরক হচ্ছে দীনী ও রূহানী, ধর্মীয় ও আত্মিক প্রেরণা। তা এমন এক শক্তিশালী উৎক্ষেপক যা অতিশয় ভারী যে কোন বস্তুকে মুহূর্তের মধ্যে ভূতল থেকে সুউচ্চ প্রাসাদের ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপন করতে পারে। কয়েকটি নমুনা ও দৃষ্টান্ত আমি পেশ করার প্রয়াস পেয়েছি। মোটকথা, যথার্থ উদ্দীপনা সৃজিত হলে মানুষ যে কোন ভাষায় সে ভাষাভাষীদের চাইতে অনেক অগ্রগামী হতে পারে। কেননা, দীন ও আত্মিক অনুপ্রেরণা যখন বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করছে, তাহলে সে অনুপ্রেরণা যত সবল হবে, কলম ও ভাষা ততই বেগবান ও ক্রিয়াশীল হবে। আরবী ভাষার কোন তালিবে ইলম, কোন প্রকৃত ছাত্র যদি আল-কুরআনকে তার মূল রূহ ও স্পিরিট সহ আহরণ করতে দৃঢ় সংকল্প হয় এবং সে অনুসারে নিরলস সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, তা হলে আমি আপনাকে নিশ্চিত গ্যারান্টি দিতে পারি যে সে এক্ষেত্রে যে কোন উল্লেখ যোগ্য আরবী ভাষীর চাইতে অগ্রগামী হয়ে যাবে।

মানুষের ধীশক্তি ও তার সুপ্ত প্রতিভাকে আন্দোলিত করার সর্বাধিক শক্তিশালী উপকরণ বা যন্ত্র হল প্রেম ও উদ্দীপনা। এ প্রেম ও উদ্দীপনার

---

১. বিখ্যাত মানতিক গ্রন্থ 'সুল্লামুল উলুম'-এর মুসান্নিফ মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ বিহারীর অপর রচনা হল মুসাল্লামুছ ছুবুত।

আত্মিক শক্তিই ইকবালের মুখ থেকে নিঃসৃত করেছে এমন ফরাসী কাব্য সম্ভার যার তুলনা পেশ করতে পারেনি আধুনিক ইরানও। উর্দুতেও একই অবস্থা। লাহোর অবস্থান করে (অথচ তাঁর কথ্য ভাষা ছিল পানজাবী) তিনি পেশ করেছেন এমন অনবদ্য উর্দু কাব্য যা পাঠকের রক্ত-প্রবাহে সৃষ্টি করে উদ্দাম গতিধারা। লাখনো, দিল্লীর সমঝদার পাঠকদেরও স্বীকার করতে হয়েছে যে, ইকবালের বাণীতে যে অন্তর্দাহ ও বিদ্যুৎ ক্রিয়া রয়েছে, তাতে যে উচ্চমানের আদিভৌতিক বিষয় বস্তু রয়েছে, তা সে সব রথী-মহারথী কবিদের কাব্যতে অনুপস্থিত, যারা সেই অন্তর্দাহ থেকে বঞ্চিত।

একটি না'ত পরখ করে দেখুন, উর্দু-ফার্সীর না'ত ও নবী প্রশস্তি কাব্যে যে সজীবতা, যে স্পন্দন, যে উদ্দীপনা ও যে প্রভাবক্রিয়া রয়েছে, তা আরবী না'ত কাব্যে (ব্যতিক্রম বাদে) অনুপস্থিত। ১৯৫৬ খৃঃ দামেশকের একটি মজলিসের কথা মনে পড়ে। মজলিসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-সাহিত্য বিভাগের অনেক খ্যাতিমান অধ্যাপক এবং নগরীর সাহিত্যিকবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এক মনীষী আমাকে প্রশ্ন করলেন, বলুন তো, আরবীর না'ত কাব্যে সে প্রতিক্রিয়া নেই কেন, যা উর্দু-ফার্সীর না'ত কাব্যে রয়েছে। আপনার অনুবাদ ও আলোচনা শুনে তা-ই মনে হচ্ছে। জবাবে আমি বললাম, এর কারণ দ্বিবিধ। এক—দূরত্ব ও বিরহের অনুভূতি। যে মনীষীগণ এ না'ত সম্ভার পেশ করেছেন, জামী, কুদ্সী, ইকবাল হন, কিংবা জাফর আলী খান, মাহির আল কাদিরী আর আমজাদ হায়দারাবাদী হন, তাঁদের প্রত্যেকের মাঝে উদ্বেলিত হচ্ছিল প্রবল আকর্ষণ, দূরত্ব ও বিচ্ছেদ বঞ্চনার অনুভূতি। দ্বিতীয় কারণটি হল—হৃদয়ের জ্বালা ও অন্তর্দাহ, মনের অচঞ্চল আকুতি। এর প্রভাবে হৃদয়ের নিভৃত কোন থেকে উদ্বেলিত হয়েছে বিষয় ও ভাষা; তাতে এসেছে আকর্ষণীয় ক্রিয়াশক্তি, ভারতের কোন কোন দা'ঈ ও দীনের আহবানকারী ইদানিংকার কোন কোন আরবী রচনাও অনুরূপ গুণ সমৃদ্ধ। ঐ উদ্দীপনা ও পটভূমি আরবী রচনা সাহিত্যে এক অভিনব পদ্ধতি ও নব দিগন্তের সূচনা করেছে। তাতেও রয়েছে সেই গতিবেগ, মনোহারিত্ব ও আকর্ষণী শক্তি; যার প্রভাব এড়ানো শ্রেষ্ঠ আরবী সাহিত্যিকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বরং তাদের রচনা পাঠে খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের চোখও অশ্রু আপ্লুত হয়েছে।

শ্রোতৃমণ্ডলী! আরবী ভাষার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব ও কার্যকারিতা আমি অস্বীকার করছিনা। আমি শুধু আবেদন করতে চাই যে, আপনারা ঐ সূত্রদ্বয়ের সাথে বুনিয়াদি ও মৌলিক তথ্যটি

যোগ করে নিন। তা হল এই যে, আরবীর মূল লক্ষ্য ও প্রকৃত কার্যকারিতা হচ্ছে যথাযথ ভাবে দীনের সমঝ হাসিল করা, কুরআন হাদীছের গূঢ়তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম রহস্য কুরআন হাদীছেরই ভাষার মাধ্যমে এবং তাদের ধারক ও বাহকের মর্যী ও লক্ষ্যের সাথে সংগতি রক্ষা করে অবগত হওয়ার চেষ্টা করা। আর কিঞ্চিত পরিমাণ মর্মজ্বালা ও অন্তরদাহ সৃষ্টি করা। তা করা হলে আমি আপনাকে এ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে তখন আরবী ভাষা আপনাকে তার ভাণ্ডার অবারিত করে ঢেলে দিবে।

এপ্রসংগে আমি এ কথাও নিবেদন করব যে, আরবী ভাষা শুধুমাত্র রাজনৈতিক, কুটনৈতিক বা আর্থ-সামাজিক ভাষা নয়। ব্যক্তি মানুষ, মানব সম্প্রদায় ও জাতি এবং বিভিন্ন দেশের ন্যায় ভাষা সমূহেরও মেযাজ ও স্বভাব প্রকৃতি এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আরবী ভাষার মেযাজ হচ্ছে নববী, ঈমানী ও দাওয়াতী তথা নবীওয়ালা, ঈমান বাহক এবং দীনের প্রতি আহ্বান সুলভ মেযাজ। জনৈক আরব কবি বলেছেন—

و مكلف الأشياء ضد طباعها—متطلب في الماء جذوة نار

"কোন বস্তু থেকে তার প্রকৃত বিরোধী কর্ম সাধনে সচেষ্ট ব্যক্তিকে তুলনা করা যায় এমন লোকের সাথে, যে পানির ভিতর অগ্নিশিখা পেতে চায়।"

আপনাদের অভ্যন্তরে আরবী ভাষার বুনিয়াদ ও উৎস সমূহের সাথে সহমর্মিতা, সমবেদনা আগ্রহ উদ্দীপীত হোক, আরবী ভাষা যে সব বুনিয়াদ ও উৎসের বহিঃপ্রকাশে জন্ম নিয়ে ক্রম অগ্রগতি লাভ করেছে এবং সে সবের ভিত্তিতে তার এ অধিকার স্বীকৃত হয়েছে যে, ভারতবর্ষে বাস করেও আমরা তা অধ্যয়ন ও তাতে দক্ষতা-বুৎপত্তি অর্জন করবো, সে বুনিয়াদ-গুলিকে আমাদের মাঝে সুদৃঢ় করতে হবে। এমন করলে আপনি দেখতে পাবেন যে, অন্যান্য উৎস-উপকরণের চাইতে তুলনামূলক কম সময়ে আপনি আরবী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হবেন।

উদ্যোক্তাগণকে মুবারকবাদ! আজকের এ সেমিনার সময়ের বিচারে যথাযথ এবং গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার মানদণ্ডে যথার্থ ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নিসাব ও কারিকুলাম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি পরিবর্তনশীল, তাই সে সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করা এবং তা অধিক ফলপ্রসূ ও কার্যকর করে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ ও পন্থা উদ্ভাবন অপরিহার্য। নিসাব ও

তা'লিম ও এর তরীকা শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কীত আলোচনা আপনাদের সমীপে পেশ করা হচ্ছে। আমাদের আরবী মাদ্রাসা সমূহের উস্তাদবৃন্দ ও পরিচালক-কর্তৃপক্ষকেও সে আলোচনা থেকে আলো গ্রহণ করা কর্তব্য। বন্ধুবর ডক্টর আবদুল হালীম নাদভীকে অনুরোধ করবো তিনি যেন এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ সেমিনারের আলোচনা-সিদ্ধান্ত সমূহ সংকলন-প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন। তাহলে তা সেমিনারের একটা সুন্দর স্মরণিকা হয়ে থাকবে এবং তা হবে জাতির জন্য একটি কল্যাণকর পদক্ষেপ। পরিশেষে আর একবার উদ্যোক্তা-কর্তৃপক্ষের শুকরিয়া আদায় করছি, যাঁরা আমাকে সম্মানিত করেছেন এবং মনের কথাগুলি বলার সোনালী অবকাশ করে দিয়েছেন।

— o —

মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

[১৩ই অক্টোবর সন্ধ্যায় হায়দারাবাদের মাওলানা আবুল কালাম আযাদ অরেন্টিয়েল রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ। ইনস্টিটিউট প্রধান নওয়াব মীর আকবার আলী খান পরিচিতি মূলক উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন।]

হামদ ও সালাত ঃ

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا

সংশোধনের পর পৃথিবীতে আবার তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করো না।
[সূরাতুল আ'রাফ ঃ ৮৫]

আমার প্রিয় মুসলিম ভাইগণ !

আপনাদের সামনে আমি কুরআনুল কারীমের একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। যুগে যুগে আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূলগণ যেমন করেছেন তেমনি হযরত শো'আয়েব (আঃ)ও অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় আপন জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছেন। "হে আমার জাতি! আল্লাহর যমীনে ইসলাহ ও সংশোধনের পর তাতে আবার ফাসাদ ছড়ায়োনা।" কত সরল ও অনাড়ম্বরপূর্ণ তার এ আবেদনের ভাষা অথচ কি ব্যাপক ও গভীর অর্থবহ এবং কেমন মর্মস্পর্শী ও দরদপূর্ণ এর প্রতিটি শব্দ !

সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকদের সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণতঃ বলা হয়, ফাসাদ সৃষ্টি করো না, গোলযোগ উসকে দিওনা কিংবা অরাজকতার পথ উন্মুক্ত করোনা। কিন্তু হযরত শো'আয়েব (আঃ) তাঁর জাতির কাছে এই বলে আবেদন জানিয়েছেন—

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا

অর্থাৎ—আল্লাহর যমীনে, কোন দেশে সমাজ-সভ্যতা ও জীবনের গতিধারাকে মুক্তির পথে ফিরিয়ে আনা আল্লাহর সাথে বান্দার বিস্মৃত সম্পর্ক-পুনঃ প্রতিষ্ঠা, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপন এবং জুলুম-শোষণ, ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠন ও অধিকার হরণের মত পাশব বৃত্তি নির্মূল করার এ মহান জিহাদের কল্যাণে আল্লাহর বান্দাদের জীবনে আজ আমূল

পরিবর্তন এসেছে। সমাজ জীবনে কল্যাণ ও সংস্কৃতির অমিয়ধারা প্রবাহিত হয়েছে। সুতরাং দোহাই আল্লাহর; তাদের দীর্ঘ সাধনা ও কোর-বাণীর ফসল নষ্ট করে দিওনা।

বুকের রক্তে এ উদ্যান সজীব হওয়া শুরু হয়েছে, এজন্য বহু জনের ইজ্জত, আবরু বিসর্জন দিতে হয়েছে, পরিবার পরিজন কোরবান করতে হয়েছে, দুনিয়ার সুখ শান্তি ও আরাম আয়েশের মোহ ত্যাগ করতে হয়েছে। একটি মাত্র উদ্দেশ্যই ছিলো তাদের জীবনে, একটি মাত্রই উদ্দেশ্যই ছিলো তাদের সামনে। তারা চেয়েছিল মানুষকে মানুষ হয়ে এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে জীবন যাপনের পথে ফিরিয়ে আনতে; মুক্তোমালার মত মানব সম্প্রদায়কে অভিন্ন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে; মানব সম্প্রদায়! তোমরা সকলে আদম (আঃ)-এর সন্তান আর আদমকে তৈরী করা হয়েছে মাটি দিয়ে। এই মহান বাণী ছিল তাদের নিয়ামক। আল্লাহর কসম! মালা ছিঁড়ে ফেলনা, মুক্তোগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে যে! ইতিহাস সাক্ষী! এই মুক্তাগুলি যখনই মানব ভ্রাতৃত্বের সংযোগ সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তখন সেগুলি শুধু ছড়িয়ে পড়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং শুরু হয়েছে বিরতিহীন সংঘাত। তখন তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে চুম্বকের সমমেরুতে বিকর্ষণের ন্যায় বিকর্ষণ ও স্পর্শ-বিদ্বেষ অবস্থান। তারা একে অপরকে আঘাত হেনেছে তরংগমালার ন্যায়, হাতাহাতি ও হানাহানি করেছে উদাম-উলংগ হয়ে। এভাবে সংযুক্ত মুক্তামালা ও 'তাসবীহের মুক্তা ও দানাগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে মাটিতে বিলীন হয়ে যায়নি, বরং পাশপাশি যথা সম্ভব সম্মিলিত হয়ে, বাহিনীর রূপ ধরে আক্রমন চালিয়েছে দূরের মুক্তা ও দানাগুলোর উপরে।

একবার আমি বলেছিলাম যে, পৃথিবীর বুকে শুধু অন্যায়-অসভ্যতাই আর এক অন্যায়-অসভ্যতার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এমন নয় বরং একতাও লড়েছে একতার বিরুদ্ধে, সমষ্টি আঘাত হেনেছে আর এক সমষ্টিকে। যে ঐক্যের ভিত্তি গলদ, যে একতা মানব-প্রেম, মানব-ভ্রাতৃত্ব ও রাব্বানী উবুদিয়াত-আল্লাহর দাসত্বের ভিত্তিতে রচিত হয়নি, যে ঐক্য অধিকার আদায় ও দায়িত্ব কর্তব্য পালনের সুষম বণ্টন ও ভারসাম্য রক্ষা, আল্লাহর ভয় এবং মানুষের জান মালের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সে একতা ও সমষ্টি ভয়াবহ ও ভয়ংকর। মোটকথা, বিক্ষিপ্ত মুক্তা ও দানাগুলি কখনো সীমিত অবস্থানে অবস্থান করেনি। আর নবীগণের আজীবন সাধনা ছিল বিক্ষিপ্ত মুক্তাগুলি মালায় গেঁথে দেওয়া, দানাগুলি তাসবীহের সুতায়

জুড়ে দেওয়া। প্রতিপক্ষে শয়তানের জীবনের পণ হলো সেগুলিকে বার বার বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া। হযরত শুআয়ব (আঃ)-এর বাণীতে রয়েছে মনের আকুলতা ও মর্মস্পর্শীতার পরিচয়। আল্লাহর নবী-রাসুলগণ শত শত বছরের মিহনতে মানুষদের মানবতার সবক শিখিয়েছেন। মানুষ হয়ে বসবাস করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মানুষের পরিচিতি পানির মাছ নয় যে, যথেচ্ছা সাঁতরে বেড়াবে, শূন্যের পাখী নয় যে যথেচ্ছা উড়ে বেড়াবে, জংগলের সিংহ নয় যে গর্জন করতে থাকবে, বাঘ ভালুক নয় যে ছিঁড়ে ফেঁড়ে উদরপূর্তি করবে। মানুষের সংজ্ঞা হল, এমন এক প্রাণী যারা আল্লাহর বান্দা হয়ে পৃথিবীতে অবস্থান ও চলাচল করবে। এ বিশ্ব আল্লাহ পাকের, তোমরাও আল্লাহ পাকের, তাহলে হানাহানি আর অবাধ্যতা-বিদ্রোহ কেন? তাই তিনি বলেছিলেন—

ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها

(সুশৃংখল ও সুসংহত করে দেওয়ার পর যমীনের বুকে বিশৃংখলা-সংঘাত ঘটিও না।) اصلاح (ইস্‌লাহ—সংস্কার সাধন, সংশোধিত করা) একটি সকর্মক ক্রিয়া মূলে। সুতরাং তার জন্য চাই একজন মুসলিহ—সংস্কারক ও সংশোধক। অর্থাৎ দা'ওয়াত ও আহ্‌বান, মিহনত ও সাধনা। সর্বোপরি আল্লাহ পাকের দেওয়া তাওফীক ও কল্যাণ সাধন ক্ষমতা। শব্দটি এক ব্যাপক অর্থ নির্দেশক। আয়াতের এ একক শব্দ বিবৃত করেছে নবুয়তের ইতিকথা। সে ইতিহাস—যখন নবীগণ অর্থাৎ মানব বাগানের চারাগাছগুলির পরিচর্যাকারীগণ তাঁদের বরকতময় ও কল্যাণবহ সাধনা অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ভূখণ্ডকে রূপান্তরিত করে ছিলেন জান্নাতের শান্তি নিকেতনে। ফলে মানুষ মানব কল্যাণে বিলিয়ে দেওয়াকে মনে করত সৌভাগ্য। অন্যের কল্যাণে সর্বস্ব ত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল মানুষ। ডাকাতেরা পাহারাদার হয়েছিল, হিংস্ররা হয়েছিল রক্ষক রাখাল। আত্ম বিসর্জন ও পরকল্যাণের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল যে, ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন অকাট্য সাক্ষ্য না পাওয়া গেলে তা বিশ্বাস করা ছিল সত্যই সুকঠিন[১]। কোন দেশ, কোন সমাজের বুকে বিদ্যমান

---

১. একটি দৃষ্টান্তঃ খিলাফতে রাশিদার যুগে কোন এক যুদ্ধে আহত এক মুসলিম যোদ্ধার কাছে তার ভাই পানির পাত্র এগিয়ে দিলে তিনি অপর এক আহতের দিকে ইংগিত করে বললেন, তাঁকে পানি পান করাও। তার হাত মুখ ধুয়ে দাও। দ্বিতীয়জন তৃতীয় জনের দিকে ইংগিত করলেন একই কথা বলে। একের পর এক চলল অপরকে অগ্রাধিকার প্রদানের এ ধারা। একে একে সবাই ঢলে পড়লেন শাহাদতের প্রশান্ত কোলে। পানি রয়ে গেল যেমন ছিল তেমনই।

শৃংখলা ও সংহতি নিরাপত্তার পরিবেশ ক্ষুন্ন করা, পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল ও স্বার্থ বিজড়িত সামাজিক সংহতি ভেংগে দেওয়া, সংকীর্ণ ও পংকিল স্বার্থপরতার বশীভূত হয়ে ঐক্যবদ্ধ ও সংহতি-পূর্ণ সমাজ ভেংগে পর্যুদস্ত ও চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া আল্লাহর বিধানে কঠিন অপরাধ, এবং সংস্কার প্রয়াস নবীগণের প্রতি ক্ষমার অযোগ্য জুলুম ও অনাচার, কোন সমাজে সৃষ্ট কোন বিশৃংখলা, অবক্ষয় দেখে মানুষ যদি মনে করে যে, ওদের বিপদে আমাদের কি যায় গেল, ওদের মহল্লায়, ওদের সমাজে অমুক শহরের অমুক অংশে কিংবা অমুক প্রদেশে জীবন মান লুণ্ঠিত হচ্ছে, নাগরিক অধিকার বিপর্যস্ত হয়েছে, অমুক জেলায় বা প্রদেশে মানুষ মানুষকে হত্যা করছে, লুণ্ঠন অগ্নি সংযোগ জ্বালাও পোড়াও চলছে, নিঃসংগ বা বিদেশী পথচারীদের ছিনতাই করা হচ্ছে—গুম খুন চলছে চলুক আমাদের কি ক্ষতি হল? আমাদের এলাকা, আমাদের সমাজ মহল্লাতো নিরাপদ রয়েছে! এ হেন কূপ-মন্ডুকতা ও আত্ম গরুজে চিন্তার কুফল কি হতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত শুনুন। হাদীছে নববী থেকে এ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি, সংস্কার সাহিত্যতো বটেই, মানবতাবাদের বিশ্ব সাহিত্যেও এর চাইতে উত্তম দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই।

সহীহ হাদিছে বর্ণিত হয়েছে—রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন—কতক মুসাফির কোন জাহাজে আরোহী হল। জাহাজটি দ্বিতল। উপর তলা প্রথম শ্রেণী ও নীচতলা ডেক। লক্ষ্য করুন, এ দৃষ্টান্তটিও নবী আলাইহিসসালামের অন্যতম মু'জিযাহ। কেননা, জাহাজ শিল্পের ইতিহাসে যতদূর জানা যায় তখনও পর্যন্ত তাতে এত অগ্রগতি হয়নি যে, প্রথম ও ডেক শ্রেণী করার জন্য দ্বিতল জাহাজ নির্মাণ করা হবে। তদুপরি আরব ব-দ্বীপের এ ভূখন্ডের অবস্হান সাগর থেকে অনেক দূরে অবস্হিত, তাই তাঁর পক্ষে এমন দ্বিতল জাহাজের দৃষ্টান্ত প্রদান ঐশী-ইলম নির্ভর ছাড়া আর কি হতে পারে? দোতলায় কিছু যাত্রী রয়েছে (আমরা তাদের প্রথম শ্রেণী বা আপার ক্লাস বলতে পারি। নীচ তলায়ও যাত্রী রয়েছে। সাধারণতঃ গরীব-দুঃখীরা ওখানে সওয়ার হয়) খাবার পানির ব্যবস্হা দোতলায়, (আপার ক্লাসকেতো কিছুটা অধিক সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে) নীচতলার লোকেরা দোতলা থেকে খাবার পানি নিয়ে আসতে বাধ্য। পানি নিয়ে আসার সময় সভাবতঃই কিছু পড়ে যায়। আর জাহাজের দোতলার কারণেও কিছু পড়ে থাকে। শত সতর্কতা সত্বেও কিছুনা কিছু পড়েই যায়। কারণ পানিতো আর জানে না যে অমুক নবাব সাহেবকে ভিজিয়ে দেওয়া উচিত নয়, অমুক লাট সাহেবের

গায়ে ছিটে পড়া উচিত নয়, অমুক শেঠের কাপড় ভিজিয়ে দেয়া অন্যায়। কিন্তু বার বার এ বেআদবী হওয়ায় আপার ক্লাসের মনে আঘাত লাগল। তারা আলোচনা করলেন, নীচের ইতরদের এ বাড়াবাড়িতো আর সহ্য করা যায় না। একজন ফোড়ন কাটলেন—আমাদের সাথে বেশ তামাশা করা হচ্ছে, পানি নেবে তারা তাদের প্রয়োজনে, আর পেরেশানী পোহাতে হবে আমাদের? না এ আর চলবেনা। তারা নীচতলার লোকদের নোটিশ দিয়ে দিল, পানির জন্য আর উপরে এসনা, নীচেই আপন বন্দোবস্ত করে নাও। নীচতলার লোকেরা পরামর্শে বসল পানিতো জীবনের সমস্যা। ব্যবস্হা একটা করতেই হবে। ঠিক আছে, উপরে যাওয়া নাজায়েয হলে আমরা নীচেই ব্যবস্থা করে নেব। নীচে একটি ছিদ্র করে নেই, বসে বসেই বিনা মেহনতে পানি পেয়ে যাব। কারো দয়ার উপর ভরসা করতে হবে না, বড় লোকদের চোখ রাঙানীও দেখতে হবে না। কারো তেল মালিশ, তোষামোদ করতে হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—(ভাবার্থ) দোতলার মসনদারোহীদের মাথায় যদি গোবর না থেকে থাকে, তাদের বুদ্ধি যদি ভোঁতা না হয়ে থাকে, এবং তাদের যদি কপাল পুড়ে না থাকে, তাহলে তারা অবিলম্বে নীচ তলার লোকদের খোশামোদ করতে শুরু করবে, তাদের হাত ধরে বলবে, বন্ধুরা, অমন কর না, তোমরা নির্বিবাদে উপর থেকে পানি নিয়ে যেও, (চাই কি আমরা তোমাদের এগিয়ে দিব।) তবুও দোহাই আল্লাহর, এমন কাম কর না। নীচে ছিদ্র কর না। কারণ, জাহাজ ডুবে গেলেতো সবারই সলিল সমাধি ঘটবে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ডুবলে, প্রথম শ্রেণী ওয়ালারাও ডুবে মরবে।

আমাকে আপনাকে বাহ্যতঃ এ দেশেই জীবন কাটাতে হবে, মনে রাখতে হবে যে, দেশবাসীর জীবন মানব সমাজ ও সভ্যতার জাহাজ তুল্য। আমরা সকলেই এক জাহাজের যাত্রী। এখন যদি আমরা স্বার্থ-সিদ্ধির নীতি গ্রহণ করি, আত্মগরুজে হয়ে যাই এবং নিজের ঘরে বসেই মিঠা পানির ব্যবস্হা করতে চাই, তাহলে কপালে ভালাই নেই। মিঠা পানির চেষ্টা ঘরে বসে করার অর্থ নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করা, নিজের স্বার্থ হাসিলের বুদ্ধি করা। আমার কাজ হয়ে গেলে আর কার কি হল, তাতে আমার কি? এ মনোবৃত্তি ও কর্ম পদ্ধতি জাহাজের নীচতলায় ছিদ্র করারই সমার্থক। আমাদের এ দেশ নামক জাহাজে আজ কতজন কত কত ছিদ্র করে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই ব্যস্ত আপন চিন্তায়। সংকীর্ণ মনোবৃত্তিতে অন্যের প্রতি চোখ বন্ধ করে রয়েছি আমরা প্রত্যেকে। সমাজ ও সমষ্টির জীবনে এর কুফল কি হতে পারে, সে বাস্তবতার ব্যাপারে আমরা আত্মভোলা হয়ে রয়েছি। আর শুধু এ দেশই নয়, সারা বিশ্ব আজ এ ব্যাধির শিকার।

বৈরুতে যা কিছু ঘটে গেল, তা এ সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগীর কুফল। ইস্‌রাঈল দেখল, সুবর্ণ সুযোগ। এ ফাঁকেই উদ্দেশ্য হাসিল করে নিতে হয়। এ স্বার্থ সিদ্ধির বেদীতে কতজনকে যে জীবনের বলি দিতে হল, মানবতার কি অধঃপতন ঘটল, তা তো গৌণ ব্যাপার। লেবাননের মারুনী উপদলীয় সংগঠন (কালাঞ্জীরা) মনে করল, এখনই সময়, এখন আমরা এক বড় শক্তির সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছি। অতএব আমাদেরও কার্যোদ্ধার করে নেয়া উচিত। সেখানে যা ঘটেছিল, তা ছিল ভয়াবহ, জঘন্য ও সম্পূর্ণ নৈতিকতা বর্জিত। তাই তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সারা বিশ্ব সে ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল, তাদের ঘৃণা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আমদের দেশে যা চলছে ও ঘটছে তার প্রকৃতিও অভিন্ন। ব্যবধান শুধু স্তর ও মাত্রার। এখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও অঞ্চল তাদের স্বার্থ সিদ্ধির ফিকিরে লেগে রয়েছে। প্রত্যেকে প্রাধান্য দিচ্ছে তার বংশ ও সমাজের। তা সে যতই অযোগ্য, অপাত্র হোক না কেন। আমাদের সমাজ জীবনে রাজত্ব চলছে স্বজন প্রীতি ও স্বজন তোষণের।

আল্লাহ পাকের নবীগণতো জগতবাসীকে সবক দিয়েছিলেন শান্তি ও নিরাপত্তার। বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় ও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন একক ব্যক্তিকে আবদ্ধ করেছিলেন সম্প্রীতি ও একতার বন্ধনে। আপনি উদার গভীর দৃষ্টিতে ঈমানদারী বিশ্বস্ততা নিরপেক্ষতার সাথে খোঁজ লাগিয়ে বিচার করে দেখুন এবং ইতিহাসের পরিচ্ছেদগুলিকে পর পর বিন্যস্ত করে দেখুন, তাহলে আপনার কাছেও প্রতীয়মান হবে যে, আজও পৃথিবীতে মানবতার যে অবশিষ্ট পুঁজি বিদ্যমান, মানুষের মনে প্রেম-ভ্রাতৃত্বের যে ক্ষীণ ধারা বয়ে চলছে, মানব জীবনে শান্তি নিরাপত্তা ও আল্লাহ পাকের ভয়ের যে প্রতিফলন পরিদৃষ্ট হচ্ছে এবং মানুষের দৃষ্টিতে মানুষের জান-মাল-ইজ্জত-আবরুর যেটুকু গুরুত্ব ও মূল্য আজও অবশিষ্ট রয়েছে, তা আল্লাহ পাকের নবীগণের এবং তাদের বাণী পয়গামের বদৌলতে এবং পরবর্তীতে তাঁদের পদাংক অনুসারী নবীগণের সম্পাদিত মহৎ কর্মকে জীবন্ত রাখার সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ দীনের দরদ সম্পন্ন আল্লাহ ওয়ালাগণের মিহ্‌নতেরই সুফল। আল-কুরআন ইরশাদ করেছেঃ

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ

بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا - وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا -

"আর স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের নিয়ামাত অনুগ্রহের কথা, (এ বিষয়ে যে) যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, আল্লাহ পাক তোমাদের মনগুলিকে জোড়া লাগিয়ে দিলেন, তোমরা তাঁর মেহেরবাণী ও অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা উপনীত (হয়ে) ছিলে অগ্নি গহ্‌বরের একেবারে প্রান্তে, তিনি (আল্লাহ্‌ পাক) তোমাদের রক্ষা করলেন অক্ষতভাবে ও নির্বিঘ্নে। [সূরা আল-ইমরান—১০৩]

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বিশ্ব মানবতা এসে দাঁড়িয়েছিল ধ্বংস গহ্‌বর ও সম্মিলিত আত্ম হননযজ্ঞের এক ভয়াবহ খাদের প্রান্তে, আর তারা তাতে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে ফেলেছিল। তখনই আবির্ভূত হলেন আল্লাহ্‌র এক প্রিয় বান্দা মুক্তির দিশারী নবীয়ে উম্মী (আমার আত্মা তার তরে উৎসর্গিত) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি নিজেই যেমন একবার ইরশাদ করেছিলেন—"আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন যেন, কেউ আগুন জ্বালাল, পতংগদল আত্মহারা হয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল, অনুরূপ ভাবে তোমরাও (জাহান্নামের) আগুনে ঝাঁপ দিতে চাচ্ছ, আমি তোমাদের কোমর ধরে ধরে দূরে সরিয়ে রাখছি।" মানব জাতি ও মানবতার ইতিহাস আপনি খুলে দেখুন; দেখবেন, বার বার এমনই হয়েছে যে, দ্বিপদ মানুষ রক্ত পিপাসু হিংস্র চতুষ্পদে পরিণত হয়েছে, তখন আল্লাহ পাকের কোন নবী পয়গাম্বর শুভাগমন করে সে হিংস্র জিঘাংসাবৃত্তি সম্পন্ন মানুষকে কামিল ইনসান ও পরিপূর্ণ 'মানুষে' পরিণত করেছেন। ডাকাত লুটেরাদের বানিয়ে দিয়েছেন পাহারাদার, হিংস্র পশুকে করেছেন পশুপালের রাখাল। নিরক্ষর অ,-আ ক, খ-য়ে অজ্ঞ এবং মানবতায় অপরিচিতদের গড়ে তুলেছেন নৈতিকতার শিক্ষক ও আইন প্রণয়নকারী রূপে। কবির ভাষায়—

درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا
دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
خود نہ تھے جو راہ پر غیروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

'মুক্তা বরষণে তোমার বিন্দু হল বিশাল বারিধি সমান,
হৃদয়ে জ্বালালে নূরের মশাল, নয়নে করিলে দৃষ্টিদান।
পথ হারা ছিল যারা, তাদের করিলে দিশারী জগতের;
পরশ দৃষ্টি তব মুরদারে বানাল জীবন দাতা"

অর্থাৎ—তোমার পরশ স্পর্শে সংকীর্ণ উদার হল, আঁধার মনে আলো উদ্ভাসিত হল, কল্যাণ দৃষ্টি উম্মোচিত হল, ভ্রান্তরা পথ প্রদর্শক হল আর মৃতরা হয়ে গেল অন্যদের ত্রাণ কর্তা।

আমাদের এই উপমহাদেশেও যৈটুকু মায়া-মমতা ও মানব প্রেম আজও অবশিষ্ট রয়েছে, তা সেই মনীষী সূফী-দরবেশগণেরই ঋণ ও অবদান। যারা ছিলেন মুহাব্বাত ও মানব প্রেমের পয়গাম বাহক। মাহ্‌বুবে ইলাহী (আল্লাহ্‌র প্রিয়) হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)—যাঁর খলীফার খলীফা ছিলেন আপনাদের শহরে শায়িত হযরত খাজা গীসু দারায (রঃ)। তিনি বলেছেন—দেখ, কেউ তোমার জন্য (পথে) কাঁটা রেখে দিলে (তোমাকে নির্যাতন করলে) তুমিও যদি বিনিময়ে কাঁটা রেখে দাও দুর্ব্যবহার কর তাহলেতো কাঁটার ছড়াছড়ি হয়ে যাবে, জঞ্জালে দেশ ছেয়ে যাবে। আর তোমার বিপক্ষের কাঁটা রাখার জবাবে যদি তুমি ফুল দিতে পার তা হলে ফুলে ফুলে ফুল সজ্জা হয়ে যাবে পৃথিবী। প্রেম ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে। সুতরাং কাঁটার ঔষধ কাঁটা নয়; কাঁটার প্রতিষেধক হচ্ছে ফুল। আর একবার তিনি বলেছিলেন—বাঁকার সাথে বাঁকা ও সরলের সাথে সরল আচরণ করা। সোজার সাথে সোজা, বাঁকার সাথে বাঁকা. ভালর সাথে ভাল মন্দের সাথে মন্দ, মিষ্টি দিলে মিষ্টি, তিতার বদলে তিতা এই হল সাধারণ রীতি। কিন্তু আমাদের নীতি হল সরলের সাথে সরল আর গরলের (বাঁকার) সাথেও সরল।

অর্থাৎ, ভালর সাথে ভাল, মন্দের সাথেও ভাল করা। হাদীছে পাকে ইরশাদ হয়েছে—

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَاَحْسِنْ اِلٰى مَنْ اَسَاءَ اِلَيْكَ—

"তোমার সাথে (আত্মীয়তা) বিচ্ছিন্নকারীকে জুড়ে রাখ, তোমার প্রতি অবিচারীকে ক্ষমা কর এবং তোমার সাথে যে অসদাচরণ করে, তার সাথে সদাচারণ কর।"

খাজা-ই বুযুর্গ হযরত মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) এবং তাঁরও আগে এ দেশে শুভাগমনকারী বুযুর্গদের মাঝে হযরত সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী হাজবীরী (রঃ) থেকে শুরু করে এ সিলসিলার যথার্থ উত্তরাধীকারীগণের মাঝে যার জীবন চরিত্রই দেখুন না কেন, সর্বত্রই সবার কাছে পাওয়া যাবে প্রেম প্রীতি ও মায়া মুহাব্বতের সবক। মর্মাহত হৃদয়ে সমবেদনার প্রলেপ মানবতা থেকে নিরাশ হওয়া মুমূর্ষ মানব

গোষ্ঠীকে সান্ত্বনা দান, সহমর্মিতা ও বেদনার সাম্য সৃষ্টি করা ছিল তাঁদের জীবনব্রত। তাঁরা এ সবক হাসিল করে ছিলেন নবীগণের পয়গাম, তা'লীম ও জীবন চরিত থেকেই। নবী চরিত্রের ব্রত গ্রহণ করেই তাঁরা বেরিয়ে পড়েছেন দেশে দেশে। মানবতার সে পাঠ শিখিয়েছেন বিশ্ববাসীকে। প্রেম ও মুহাব্বত দিয়েই তাঁরা জয় করেছেন বিশ্ব বাসীর হৃদয়। কবির ভাষায়ঃ

جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔

"মনের উপরে রাজত্ব করেন যিনি, তিনিই তো যুগ বিজয়ী।" তারা আত্ম প্রেমে বিভোর ছিলেন না। তাদের প্রতি আত্ম কেন্দ্রিকতার অপবাদ হবে জঘন্য অবিচার। আত্মকেন্দ্রিক মানুষেরা সহজে অন্যকে আঘাত হানতে পারে। দরবেশ সূফীগণ ছিলেন পরকল্যাণে নিবেদিত। তাঁরা প্রতিপক্ষকে আঘাত হানবেন না। আঘাততো হেনে থাকে তীর, কামান, বর্শা, তরবারীধারীরা। তাঁরাতো মানুষের অন্তর জয় করতেন অমীয় বাণী ও মধুর আচরণে। অবশেষে অবস্থা এমন দাঁড়াত যে, লোকেরা তাঁদের পিতা মাতা, সন্তান সন্তুতি, বংশীয় মুরব্বী এবং রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়দের তুলনায় এ আত্মিক সম্পর্ক ওয়ালাদের প্রাধান্য দিতেন। তাদের জন্য উৎসর্গ করত জান মাল ও সহায় সম্পদ।

শায়খ আহ্‌মাদ খাট্টু (রঃ) (যাঁর নামে আবাদ হয়েছে 'আহ্‌মেদাবাদ' শহর) এর ঘটনা পড়ে দেখুন। তাঁর শৈশবে, দুধপানের বয়সে দিল্লীতে একবার প্রবল তুফান হয়েছিল। বাত্যা বিপর্যয়ে তিনি তার ধাত্রী মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এক যাত্রী কাফেলার লোকেরা তাঁকে কুঁড়িয়ে পেয়ে গুজরাটের খাট্টু এলাকায় অবস্থানকারী 'মাগরিবী সিলসিলার (বুযুর্গদের পশ্চিম আফ্রিকান ও স্পেনীয় সিলসিলা) অনুসারী এক বুযুর্গের কাছে পেঁৗছে দিলেন। বাত্যা তাড়িত হওয়ায় তার জীবনীকারগণ তাঁকে নাম দিয়েছেন 'গান্‌জে বাদ আওয়ারদ' বা 'তুফানে কুড়ানো মানিক' নামে। অনেক বছর পরে তাঁর বালিগ হওয়ার বয়সে উন্নীত হওয়ার সময়ে তাঁর পরিবারের লোকেরা কোন উপায়ে সন্ধান জানতে পেরে খাট্টুতে উপস্থিত হল। তারা শায়খের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বললেন, তরুণকে ইখ্‌তিয়ার দিচ্ছি, সে ইচ্ছা করলে এখানে থাকতে পারে, ইচ্ছা করলে আত্মীয় স্বজনদের কাছে বাড়ীতে যেতে পারে। শায়খ আহ্‌মাদ সে তরুণ বয়সেও পিতা-মাতা আত্মীয় স্বজন, বাড়ী-ঘর আর

দিল্লীর আরাম-আয়েশের জীবনের চাইতে খাট্টুর দারিদ্র্য অসচ্ছলতা ও কষ্টের জীবনকে প্রাধান্য দিলেন। তিনি থেকে গেলেন সেখানেই।

এ মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য, নিজেদের প্রস্তুত করা, সার্বিক ধ্বংসের কবল থেকে দেশটিকে রক্ষা করায় উদ্বুদ্ধ হওয়া। এটা শুধু সরকার ও ক্ষমতাশীনদের দায়িত্ব নয়। সরকারের রয়েছে অনন্ত সমস্যা, ও হাজারো রাজনৈতিক স্বার্থ। আল কোরআনের আলোকে আপনাদের কর্তব্য হল দীনের নিঃস্বার্থ সাধক বর্গ দীনের পথে আহ্বানকারী মানবতার কল্যাণকামীদের এবং দেশ ও সমাজের নিষ্ঠাবান নির্মাতাদের সাধনা জলাঞ্জলী না দেয়া। আপনারা ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها বাণীর পয়গাম প্রচার করতে থাকুন। কিয়ামতে আল্লাহ পাকের আদালতে আপনার এ প্রশ্নের জবাবদিহি করতে বাধ্য হবেন যে, দেশটিতে কি ভাবে ধ্বংস যজ্ঞ সংঘটিত হল? তোমাদের কর্তব্য ছিল এমন কর্ম অবদান ও দৃষ্টান্ত পেশ করা, যাতে অন্যদের এ বোধোদয় ঘটতো যে, অর্থ জীবনের মূল অর্থ নয়, পয়সাই সব কিছু নয়, পদ ও পদমর্যাদাই মুখ্য নয়, সমাজে বিশেষ আসন প্রতিষ্ঠাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য নয়, বরং মুখ্য উদ্দেশ্য ও মূল আদর্শ আল্লাহ পাকের ভয়, এবং তার আনুষংগিক হল সৃষ্টির প্রতি সমবেদনা সহমর্মিতা। আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, এরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আপনারা 'প্রিয় ভাজন হওয়ার মর্যাদায় আসীন হোন, দেখুন না, এ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব ও চাবি আপনাদের হাতে সোপর্দ করা হয় কিনা?

ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যক্তিদের প্রিয় ভাজন ও জন নন্দিত হওয়ার বহু কাহিনী আমরা কিতাবের পৃষ্ঠায় পড়ি এবং তা আমাদের স্মরণ ভান্ডারে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সমষ্টি ও জাতীয় পর্যায়ে মিল্লাত হিসাবে 'মাহবুব' ও প্রিয় ভাজন হওয়ার ঘটনাবলীর ব্যাপারে আমরা গাফিল ও উদাসীন। আল্লাহ পাক যখন এ উম্মাতকে 'জগত প্রিয়' ও বিশ্বনন্দিত মিল্লাতে পরিণত করেছিলেন। যেমন এ মিল্লাত মানবতার রক্ষা ও তার বিকাশ সাধনে নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ কুরবানী করেছিল এবং ন্যায় ও সত্যের আঁচল মযবুত ভাবে আঁকড়ে ধরেছিল তখন চীন দেশের মত দূরদেশ থেকে সে যুগের চীন আরব দূরত্বের পরিমাণ বুঝা যায় এ আরবী প্রবাদ বাণীতে—اطلبوا العلم ولو بالصين (চীনের মত দূর দেশেও ইল্‌ম আহরণ কর) সে চীন থেকে আরবের অধিবাসী

সালতানাতের দরবারে প্রতিনিধিদল পাঠানো হল এ মর্মে যে, আমাদের দেশে এমন লোক পাওয়া যাচ্ছে না, যাদের উপরে পরিপূর্ণ নির্ভর করে মামলা মুকদ্দামার সম্পূর্ণ ন্যায় সংগত ও নিরপেক্ষ বিচারে আশ্বস্ত হওয়া যেতে পারে। আল্লাহর নামে খলীফাকে অনুরোধ, তিনি যেন এমন কিছু বিচারক পাঠিয়ে দেন,, যারা মামলা মুকদ্দামার ন্যায় নিরপেক্ষ ফায়সালা করে বিবাদ মিটিয়ে দিবেন। এটা হল মিল্লাতের 'মাহবুব' ও প্রিয় ভাজন হওয়ার স্তর ও মর্যাদা। এটা সেই সময়ের অবস্থা। যখন এ মিল্লাতের ঈমান ও বিশ্বাস ছিল—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"বিশ্বমানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে উত্থিত শ্রেষ্ঠ উম্মাত তোমরা" এর-উপরে। যারা বিশ্বাস করত যে, স্বার্থ সিদ্ধি, পারিবারিক ও বংশীয় আভিজাত্য গৌরব অর্জন এবং গোষ্ঠীভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য বিস্তারের জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়নি বরং মানবতার সেবা ও বিশ্বজনীন কল্যাণের উদ্দেশ্যে, স্থায়ী সাফল্যের পথ নির্দেশের স্বার্থে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ বিষয়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। রোমানদের মুকাবিলায় যুদ্ধরত হযরত 'উবায়দাহ (রাঃ) এর পরিচালনাধীন ইসলামী ফৌজ (সিরিয়ার) হিমসে অবস্থান করছিল। সেখানকার অমুসলিমদের নিকট থেকে জিযিয়া (নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা কর) আদায় করা হয়েছিল। কিন্তু ইতি-মধ্যে দরবারে খিলাফাত থেকে নির্দেশ এল, "ইসলামী বাহিনীর সকল সৈনিক "ইয়ারমুক' রণক্ষেত্রে সমবেত হতে। কারণ, সেখানে এক চূড়ান্ত যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সেনাপতি হযরত আবু 'উবায়দাহ নির্দেশ জারী করলেন—সেনাবাহিনী স্থানান্তরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে ইয়ার-মুক অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যেতে, এবং অমুসলিম সংখ্যালঘুদের নিকট থেকে গৃহীত 'জিযিয়া' ফেরত দিয়ে দেয়া হোক। খাজাঞ্চীকে নির্দেশ দিলেন, একটি পয়সাও যেন অবশিষ্ট না থাকে। ইয়াহুদী খৃষ্টান নাগরিকদের নিকট থেকে গৃহীত অর্থ তাদের ফেরত দেয়া হলে তারা ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইল এমন করা হচ্ছে কেন? সেনাপতি আমিনুল উম্মাহ[১] জবাব দিলেন, আপনাদের নিকট থেকে এ কর উসূল করা হয়ে-ছিল এ ভিত্তিতে যে, আমরা আপনাদের হিফাযত ও রক্ষণা-বেক্ষণের

---

১. আমীনুল উম্মাহঃ নবী আলাইহিস্‌সালাম কর্তৃক হযরত আবু 'উবায়দাহ্‌ (রাঃ) কে প্রদত্ত খেতাব। অর্থ 'উম্মাতের বিশ্বস্ত' ব্যক্তি।

দায়িত্ব পালন করব। আমরা এখন অনিবার্য কারণে সে দায়িত্ব পালন করার অবকাশ পাচ্ছি না। কারণ আমরা এখন অন্য ফ্রন্টে অভিযানে আদিষ্ট হয়েছি। আবার কবে পর্যন্ত এখানে ফিরে আসা হবে তা নিশ্চিত ভাবে আমাদের জানা নেই। সুতরাং আপনাদের নিকট থেকে গৃহীত অর্থ রাখার অধিকার আমাদের নেই। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন—সেনাপতির জবাব শুনে (সে বিধর্মী) লোকেরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। তারা বলেছিল, আল্লাহ তোমাদের আবার ফিরিয়ে আনুন ! তারা তাদের পুরাতন মনিবদের তুলনায় মুসলমানদের শাসনাধীন থাকাকে প্রাধান্য দিত। তারা বলতো, ওরাতো আমাদের নিকট থেকে ভারী ট্যাক্স উসুল করত ও আমাদের রক্ত শোষণ করত। অথচ আমাদের সাথে তোমাদের আচরণতো এই দেখলাম ! এ হল এ মিল্লাতের 'জনপ্রিয়' হওয়ার যুগের কাহিনী। এ ধরনের বহু ঘটনাই রয়েছে। যে কোন ঘটনাই শুনবেন, দেখতে পাবেন--যে কোন অঞ্চলে মুসলমানদের গমনাগমন হয়েছে, সেখানকার বাসিন্দারা মুসলমানদের সংবর্ধনায় চোখ পেতে দিয়েছে। তারা ভেবেছে, এ যে রহমাতের ফেরেশতা, তাদের আগমন অবস্থানে রোগ বালাই মহামারী বিদূরিত হবে, শস্য সম্পদে বরকত প্রাচুর্য হবে। ন্যায় ও সততা প্রেম, স্বভাব উদার্য ও নৈতিকতা, সহমর্মিতা, ও সমবেদনা এবং ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা আফ্রিকার দুর্ধর্ষ ও অজেয় বার্বার[১] জাতিকেও এমন ভাবে ইসলামে দাখিল করে দিয়েছিল এবং ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুন, ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের এমন আসক্ত ও ধারক বাহক বানিয়ে দিয়েছিল যে, তাদের ভিন্ন পথে পরিচালিত করার ব্যাপারে ফ্রান্সিসস সরকারের[২] সব কৌশল চক্রান্ত ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ পাকের ফযলে আজ পর্যন্ত সে বার্বার জাতি ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির

১· রোমানরা বার বার চেষ্টা করে বার্বারদের বশীভূত করতে পারেনি এবং অজেয় মনে করে সে চেষ্টা বর্জন করেছে।

২· ফ্রানসিসস বার্বারদের মনে স্বতন্ত্র জাতীয়তা বোধ ও সতন্ত্র সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক হওয়ার দাবী তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সে বলেছিল তোমরা আফ্রিকান. তোমরা আরব নও, আরবী তোমাদের ভাষা নয়। আরবীয় সভ্যতা সংস্কৃতি তোমাদের উপরে উপনিবেশবাদের চাপানো। তোমরা স্বতন্ত্র জাতীয়তা এবং নিজস্ব সভ্যতা ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবন এবং নিজস্ব ভাষার পুনরুজ্জীবন সাধনে ব্রতী হও। আরব মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা উদ্রেকের সব অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে বার্বাররা আজও আরবী সভ্যতা ও ভাষার ধারক ও বাহক রয়েছে।

রূপে রূপায়িত, এবং তার প্রতি তাদের আকর্ষণ ও ভালবাসা আরবীদের তুলনায় কমতো নয়ই বরং বেশীই।

সুধীবৃন্দ, ! আজ পর্যন্ত আমরা মিল্লাতের 'প্রিয়' হওয়ার বিষয়টি গভীর ভাবে বিবেচনা করে দেখিনি। 'প্রিয়' হওয়ার জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট গুণ ও নীতি রয়েছে। ব্যক্তি সে গুণাবলীতে গুণান্বিত হলে সে ব্যক্তি 'প্রিয়' হয়ে যায়। আর জাতির মাঝে তার সমাহার ঘটলে জাতি প্রিয় ও নন্দিত হয়ে যায়। পৃথিবীতে মর্যাদা ও নেতৃত্ব লাভের জন্য আজ একমাত্র পথ এটাই।

উৎসর্গ, ত্যাগ ও সেবার মনোবৃত্তি জনপ্রিয়তা বিধায়ক গুণাবলী। হুকুমাত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এর অনুগমন করে, সভ্যতা-সংস্কৃতির সাহযাত্রী বরং এর সেবক হয় এবং তাতে যে গর্ব বোধ করে। এ সবগুণ অর্জন না করে ক্ষমতা প্রাপ্তি কিংবা পদমর্যাদার কোন ভরসা নেই, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কূটকৌশল ও বুদ্ধিমত্তার কোন নির্ভরতা নেই। আজকের অপরিহার্য প্রয়োজন হল, মুসলিম তরুণ সমাজের পক্ষথেকে এক প্রমাণ পেশ যে, সে কর্মদক্ষতা, পারদর্শীতা, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য পরায়ণতা এবং বিশ্বস্ততা ও আমানাতদারী অধিক পরিমাণে আমাদের মাঝেই বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের চরম অর্থাভাব ও অনটন কালেও যদি কেউ লাখ টাকা ঘুষ দিতে চেষ্টা করে তাহলে তা স্পর্শ করা আমরা হারাম মনে করব বরং ঘুষের প্রস্তাবকারীকে দৃঢ়কন্ঠে বলতে পারব, তুমি আমার এবং আমার কওম ও মিল্লাতের মর্যাদাহানি করেছ। তোমার এদিকে লক্ষ্য হল না যে, কোন মুসলমান ঘুষ নিতে পারে না। এ আচরণের সময় মুসলিম তরুণের মুখাবয়বও এরূপ ঘৃণা ও ব্যথার অভিব্যক্তি পেশ করবে যেন কেউ তাকে গালি দিয়েছে। কোন মুসলমান জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই এবং যে কোন বিভাগে কর্মরত থাকুক না কেন সে হবে কর্ম ও নীতির আদর্শ। বাস্তব কর্ম দ্বারাই সে প্রতীয়মান করবে যে, কোন ব্যক্তি দল সংগঠন বরং সরকারও তাকে কিনে ফেলতে পারে না। মোট কথা, মিল্লাতের বিশেষ ও নিজস্ব সমস্যার সমাধান কর্ম অবদানেই নিহিত। মর্যাদাশীল মিল্লাত হিসাবে মুসলমানদের টিকে থাকার পথ ও পন্থা এতেই সীমিত। আল-কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

আল্লাহ পাক কোন বিদ্যমান অবস্থা (ও অর্জিত মান মর্যাদা শান শওকত ক্ষমতা রাজত্ব) পরিবর্তিত করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে। [রাদ ঃ—১১]

আমরা ক্ষমতা হারিয়েছি আমাদের ভুলের পরিণতিতে। আমাদের অধিকার ও নির্ভরযোগ্যতা বিলুপ্ত হয়েছে আমাদের বিচ্যুতির মাশুল হিসাবে। তার

পুনঃপ্রাপ্তি নির্ভর করে যোগ্যতা অর্জনের উপরেই। দুনিয়ার কোন শক্তির সাহায্য সমর্থন তাতে কোন সুফল ফলাবে না, লেবানন ও ফিলিস্তীনের আরবরা প্রতারণার শিকার হয়েছে। কারণ তাদের কেউ নির্ভর করেছিল রাশিয়ার উপরে, কেউ ভরসা করেছিল আমেরিকার দুয়ারে। কিন্তু আল্লাহ পাক তো স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, যে ঃ

وكان الشيطان للانسان خذولا

"শয়তান যথা সময়ে পিছু হটে যায় ধাপ্পাবাজী করে।" বৈরুত ও পার্শ্ববর্তী আরবরা হা করে তাকিয়ে থাকল মুরুব্বীদ্বয়ের কেউ এগিয়ে এল না। সব কল্পনা ধুলায় মিলিয়ে গেল। তাদের কর্তব্য ছিল আল্লাহ পাকের সত্তায় এবং তাদের দ্বীনী শিক্ষা নিজেদের কল্যাণ বারতা প্রতিভা, যোগ্যতা নিজেদের মহান দা'ওয়াতী প্রোগ্রাম ও নিজেদের উত্তম আমলের উপর ভরসা করা এবং এ সবের সাহায্যে পরিস্থিতির মুকাবিলা করা। অমুকের দয়া দক্ষিণার সাথে আমাদের ভাগ্য বিজড়িত, এমন ভাবা ও বলা চরম গলদ ও বোকামী। মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ সাহায্যকারী, সহায় নেই। আল্লাহর মদদের পরবর্তী সহায়ক হল নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা। নিজেদের স্বকীয়তা কল্যাণ বারতা। আপনারা প্রমাণিত করুন যে, দেশ ও রাষ্ট্রের জন্য আপনারা অপরিহার্য অংগ। আপনাদের বাদ দিয়ে দেশ সঠিক পন্থায় গতিশীল থাকতে পারে না। আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত পুঁজি-তন্ত্র ও সম্পদ পুঁজো ক্ষমতামোহ ও শক্তির পুঁজো, সংকীর্ণ স্বার্থান্ধ দৃষ্টি ভংগী এবং আল্লাহকে না জানার পরিণতিতে সৃষ্ট ব্যক্তি ও সৃষ্টির স্বার্থ-সিদ্ধির প্রবল ধ্বংস ও অপ্রতিরোধ্য সয়লাব ও উত্তাল তরঙ্গের কবল থেকে রক্ষা করে দেশ নামক জাহাজটিকে তীরে ভিড়ানো যেতে পারে না। তাকে গন্তব্যে পৌছানো যাবে না।

সালতানাতে আসিফিয়ার (দাক্ষিণাত্য)- শেষ যুগ দেখেছেন, এমন অনেক লোক এখনো আপনাদের মাঝে রয়েছেন। তার স্মরণ তাদের তিলে তিলে দহন করে চলছে। আমি বলতে চাই, এখন তা মনে করে করে আক্ষেপ আফসুস করলে কি লাভ! অপনারা এক নতুন যুগের সূচনা করুন; উদ্বোধন করুন একটি নতুন জীবনের। আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ

سبق پڑھ پھر شجاعت کا صداقت کا عدالت کا

لیا جائیگا تجھسے کام دنیا کی امامت کا

"সবক লও সততা' সাহসিকতা, ন্যায়পরায়ণতার,
আহূত হইবে তুমি বিশ্ব নেতৃত্ব লাগি ফের।"

পুনরায় নেতৃত্ব ও ইমামাতের অধিকার সৃষ্টিকারীর গুণাবলীতে গুণান্বিত হও। বিশ্বমানবতা তোমাদের হাতেই। বিশ্ব পরিচালনার লাগাম তুলে 'শ্রেষ্ঠ উম্মাত' এবং ইমামাত ও নেতৃত্ব ব্যতীত ঐ বিশ্ব যথাযথ ভাবে কল্যাণ-কর বিশ্বরূপে পরিচালিত হতে পারে না। গোটা ইতিহাস আমার এ দাবীর প্রমাণ। পাশবিকতা, মোহান্ধতা, বাহুবল ও সম্পদের জোরে দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন চালানোকে দেশ পরিচালনা বলা যেতে পারে না। আজ বাস্তবে আমেরিক চলছে কি? রাশিয়ার চলাকে প্রকৃত চলা বলা যায় কি? যে রুশ আর যে আমেরিকার ক্ষমতার যুগে এবং সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় এমন বিভৎ-সতার বিস্তার ঘটতে পারে, যা সেদিন মঞ্চস্থ হল বৈরুতে। বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ কি তাঁর বান্দাদের এহেন জঘন্যতায় সন্তুষ্ট হতে পরেন? তিনি কি সহ্য করবেন এ বর্বরতা? তিনি কি অধিক সময় এ কীট দুষ্ট জীবন ও ক্ষমতার স্থায়িত্বের অবকাশ দিবেন? কবির ভাষায়ঃ

حذر اے چیرہ دستاں سخت ہے فطرت کی تعزیریں -

সাবধান নেকড়ে জালিম! প্রকৃতির কঠিন-বাঁধন বড় নির্মম। আল কুর-আনে— ان بطش ربك لشديد —তোমার প্রতিপালক সৃষ্টি কর্তার "পাকড়াও কঠিন পাকড়াও, খোদার ধরা শক্ত ধরা"—অনুবাদক।)

ঐ দু'টিকে (রুশ-আমেরিকাকে) তাদের কৃত কর্মের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। ওদের ছেড়ে দেওয়া হবে না। ওরা বিশ্বটাকে ভেবে রেখেছে একটা শিকার খেলার মাঠ। মানুষের জীবন ও নিরাপত্তা নিয়ে হোলি খেলছে ওরা। ওদের জন্যও রয়েছে ইয়াওমুল হিসাব—হিসাব নিকাশের দিন। পরিণতি ভোগের দিন। আর তা খুব দূরে নয়। যে বস্তু তার উপকারী সত্তা হারিয়ে ফেলে, সে তার স্থায়িত্বের অধিকারও হারায়। ইউরোপের বর্তমান মতবাদ হচ্ছে যোগ্য-তমের বেঁচে থাকার অধিকার। (Survival of the Fittest) কিন্তু আল কুরআনের দাবী হল—'অধিক উপকারী' ও মঙ্গলময় এর টিকে থাকার অধি-কার। অর্থাৎ শুধু উপযোগীতা ও দক্ষতাই যথেষ্ট নয়, উপকারী ও কল্যাণকর হওয়াও অপরিহার্য। আল-কুরআনের ইরশাদ মতে ঃ

فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ○

كذالك يضرب الله الامثال ○

'অতঃপর বুদবুদ ও ভাসমান ফেণা (খড়কুটা আবর্জনা) তাতো শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, আর মানুষের জন্য উপকারী যা (পানি), তা ভূগর্ভে সঞ্চিত হয় (থেমে থাকে)। এভাবেই আল্লাহ পাক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। (যাতে তোমরা তা অনুধাবন কর)" [রা'দ—১৭]

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কোন জাতির নৈতিক অধঃপতন আগে শুরু হয়, আর রাজনৈতিক অধঃপতন হয় পরে। গ্রীক, রোম, সাসানী সাম্রাজ্য প্রাচীন ভারতীয় সাম্রাজ্য এবং ইসলামী সালতানাত সমূহের ইতিহাস একথারই সাক্ষ্য দেয়। আমাদের দেশের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক দল সমূহের নেতৃবৃন্দ শিক্ষাঙ্গন সমূহের পরিচালকবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবী ও বিশেষজ্ঞদের কর্তব্য বাস্তব সম্মত ও সুদূর প্রসারী গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা। তাদের প্রকম্পিত হওয়া উচিত সে ভয়াবহ নৈতিক অধঃপতন লক্ষ্য করে। যার লেলিহান শিখা বেষ্টন করে ফেলেছে গোটা দেশকে এবং যার পরিণতিতে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় উজ্জল ও সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, এদেশে অর্থ, সম্পদ মর্যাদা এবং ব্যক্তি স্বজন ও রাজনৈতিক স্বার্থ শুধু কয়টি বিষয়েরই বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে এবং এ গুলিই মুখ্য উদ্দেশ্য রূপে বিবেচিত হচ্ছে। এর বাইরে অবশিষ্ট রয়েছে শুধু তাত্ত্বিক দর্শন ধর্মপ্রাণ ও ধর্মানুসারীদের সারল্য, যা তাদের ক্রমান্বয় কোনঠাসা করে দেয়ালে ঠেকিয়ে দিচ্ছে এবং যা যুগের দৃষ্টিতে নির্বুদ্ধিতা মাত্র। আর ওয়াইজ বক্তাদের বাগড়াম্বর বাচালতা, সর্বাধিক ভয়াবহ ও আশংকাজনক ব্যাপার হল এই যে, আসমুদ্র-হিমাচল বিস্তৃত এ বিশাল ভূখন্ডে এ আহ্বান এবং এ বাণী কারো মুখেই প্রচারিত হচ্ছে না যে, দেশবাসী! তোমরা চরিত্র শুধরে নাও, নৈতিকতার সংশোধন কর, মানবতার পাঠ নাও, দেশটাকে বাঁচাও, একজনও নেই! আমাদের দলে আস, অমুকের নেতৃত্ব বরণ কর, এমন আহ্বান দেওয়ার জন্য রয়েছে হাজারও মুখ। কিন্তু এ অভিযোগ কেউ করছে না যে, যা কিছু হচ্ছে সব ভ্রান্তি, সব ভুল। এক দফায় অবশ্য সকলেরই ঐকমত্য রয়েছে। তা হল ভাল মন্দ ঠিক অঠিক যা কিছু হোক আমাদের পতাকা তলে আমাদের পরিচালনায় ও আমাদের নেতৃত্বে সংঘটিত হোক।

মনের বেদনা, বেদনাহত মনের কান্না, দেয়ালের লিখন এবং দিগন্ত উদীয়মান উত্থান পতনের ভাগ্য তারকার বিধি আমি আপনাদের সামনে রেখেছি। আপনাদের শ্রুতিতে পৌঁছে দিয়েছি। এখন আপনাদের বিশেষতঃ তরুণদের দায়িত্ব পছন্দ হলে তা কাজে লাগানো। আত্মরক্ষা করুন, নিজেরা বাঁচুন, অন্যদের বাঁচান। দেশ ও জাতিকে রক্ষা করুন। নিজেরা উপকৃত হোন। দেশ ও জাতির কল্যাণ করুন। ভাগ্য ত্রাতা চিনে নিন।

আলিম সমাজের পদমর্যাদা ঃ ধৈর্য্য অবিচলতা ও বাস্তবোপলব্ধির সমন্বয়

[এ বক্তৃতার স্থান ছিল এডভোকেট জামীলুদ্দীন সাহেবের বাসভবন। সময় ছিল ১৪ই অক্টোবর, ১৯৮২ইং-র রাত। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল হায়দরাবাদের 'মাজলিস-ই-ইলমী'। উপস্থিতি ছিল হায়দারাবাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলিম, মাদরাসা সমূহের ফুযালা-শিক্ষকবৃন্দ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মন্ডলী। মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাকীউদ্দীন কিরআত তিলাওয়াত করেছিলেন। স্বাগত ভাষণ দিয়েছিলে মাওলানা রিযওয়ান কাসিমী। অতঃপর মাওলানা নাদভী তাঁর ভাষণ পেশ করেন।]

হামদ ও সালাত-এর পর।

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط (المائده—٨)

"হে ঈমানদারগণ, দৃঢ় প্রত্যয়ে আল্লাহ্র জন্য ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা রূপে অবিচল থাক। [সূরা-আল-মায়িদা—৮]

হাযরাত সুধীমন্ডলী! উলামা-ই কিরামের এমন মহতী সমাবেশে কিছু বলা বড় কঠিন ব্যাপার। একটি প্রাচীন প্রবচন রয়েছে "স্থান-কাল ভেদে কথা বলতে হয়।" সুতরাং আমি এ গুরুত্বপূর্ণ ও মহতী মজলিসের ক্ষেত্র ও পাত্রের অনুকূল বক্তব্য ও নিবেদন পেশ করতে যথাসাধ্য যত্নবান হব।

মনীষীরা ছোট ছোট ঘটনা এবং চলমান জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অমূল্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ ময়দানে শায়খ সা'দীর প্রতিভা অনন্য। মাওলানা রুমকেতো আখ্যায়িত করা হয় 'উপমা-সম্রাট' নামে। উভয় মনীষী দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী থেকে অতি সূক্ষ্ম হিকমত বিজ্ঞতাপূর্ণ সুগভীর নির্যাস আহরণ করতেন। আমিও আমার ক্ষুদ্র পরিসর অভিজ্ঞতা থেকে আহরীত একটি শিক্ষণীয় বিষয় পেশ করছি। আপনারা জানেন, আমি দিল্লী থেকে সুদীর্ঘ পথ সফর করে হায়দারাবাদ পৌঁছেছি। আল্লাহ্-ই জানেন, গাড়ী পথে পথে কত এলাকা অতিক্রম করেছে এবং কতবার দিক পরিবর্তন করেছে। কিন্তু

আমাদের দিকদর্শন (কম্পাস) সর্বদা আমাদের সঠিক ভাবে কিব্‌লাহর দিক নির্দেশ করেছে। গাড়ীর গতি বদল ও দিক পরিবর্তনের পরোয়া সে মোটেই করেনি। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। কিন্তু সেই সাথে প্রচন্ড ঈর্ষাও হল—অতি নগণ্য ও ক্ষুদ্রতর একটি জড় পদার্থ মানুষের তৈরী। অথচ কত বিশ্বস্ত, অবিচল দৃঢ়, আত্মমর্যাদাশীল, এবং কি বিস্ময়কর তার নিয়মানুবর্তীতা। সে ভ্রুক্ষেপ করেনি গাড়ীর গতি পরিবর্তনের দিকে, আর না তার উদ্ভাবক মানুষ প্রাণীটির অহরহ চঞ্চল মতিত্বের দিকে। সারা পথই সে সঠিক কিবলাহ নির্দেশ করেছে এবং আমরা তার নির্দেশনায় আশ্বস্ত হয়ে সালাত আদায় করেছি। সেই সাথে তার আচরণে আমার (মনুষ্য) মর্যাদায়ও আঘাত লাগল। আবার এ শিক্ষাও হল যে, দিকদর্শনতো সর্বদা কিব্‌লাহ্‌র দিক নির্দেশ করতে থাকল, সে তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করেনি বা লক্ষ্যচ্যুত হয়নি; তার পদমর্যাদার কর্তব্য পালনে অবহেলা করেনি। তার আচরণে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে আলিম সমাজকে মূলতঃ 'দিকদর্শন' হতে হবে। তাদের মাঝে নিহিত থাকবে দৃঢ়তা ও অবিচলতা। হাওয়া যেদিক থেকেই আসুক; আর 'পরামর্শ' দাতারা যতই আওড়াতে থাকুক যে, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی—'চালাও তরী সে দিকে, যে দিকে গতি বাতাসের।' এবং 'বুদ্ধি' খায়রাতকারীরা যতই বদান্যতা দেখাক যে, زمانہ با تو نسازد تو با زمانہ ساز "যুগ তোমার অনুকূলে না হলে, তুমিই যুগের অনুকূল হও" (আলিমগণ এ পরামর্শে উদ্বেলিত না হয়ে তাঁদের জীবনবোধ হবে দার্শনিক কবি ইকবালের শিক্ষা—(যিনি উচ্চস্তরের ইংরেজী শিক্ষিত হয়েও ছিলেন ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক কবি)

حدیث کم نظراں ہے تو با زمانہ بساز
زمانہ با تو نسازد تو با زمانہ ستیز

"যুগের সাথে তাল মিলাও উক্তি অনভিজ্ঞ দুর্ভাগার, যুগের ফ্যাশন হলে প্রতিকূল, তুমি হও যুগ নির্মাণ কারী।"

ইকবালতো আরও জোর দিয়ে বলেছেন ঃ

گفتند جہان ما آیا بتو می سازد — گفتم کہ نمی سازد گفتند کہ برہم زن

"জিজ্ঞাসিল, আমাদের এ যুগজগতের তোমার সাথে আছে কি সদ্ভাব?
বলিনু, নহে সে অনুকূল মোর; নির্দেশিল—চেপে ধর টুঁটি তার।"

যুগের চাহিদা, সমকালীন ফ্যাশন ও জীবন যাত্রা তোমার ন্যায় বোধের অনুকূল না হলে তুমি সবলে তার মোড় ঘুরিয়ে দাও। সময়ের ও যুগ

চাহিদার দাস হয়ো না; তাকে আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত কর; যুগ স্রষ্টা হও। হযরত সুধীবর্গ; আলিমগণের অবস্থা, জীবন প্রদ্ধতি এমনই স্বাতন্ত্র সম্পন্ন হইতে হবে। মুসলিম উম্মাহ বিশ্ব জাতির মাঝে এবং আলিম সমাজ বিদ্বান সমাজের মাঝে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মুসলিম উম্মাহর গতি অভিন্ন হবে। কেননা, তাদের রয়েছে একটি কিবলাহ, লক্ষ্য বিন্দু। বিশাল বিশ্বের যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন, ঐ এক কিব্‌লাহ্‌র দিকে তারা তাদের গতি ও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে। কোন জাতিকে একটি নির্দিষ্ট কিবলাহ দান করার অর্থ হল এ কথার ইংগিত দেয়া যে, তোমাদের দিলের কিবলাহ, তোমাদের অভাব ও প্রয়োজনের কিবলাহ, তোমাদের জীবন সাধনার লক্ষ্য বিন্দু তোমাদের চিন্তা ও চেতনার আবর্তন কেন্দ্র হবে এক ও অভিন্ন। সালাত আদায় কালে বায়তুল্লাহ কা'বা শরীফ এবং চিন্তা ও কর্ম তথা জীবন সাধনার সব পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত ও আবর্তীত অভিন্ন লক্ষ্যে একমাত্র আল্লাহর (যিনি প্রকৃত মাবুদ ও মাকসুদ বা উদ্দেশ্য তাঁর) রিযামন্দী ও সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে। উপস্থিত শ্রোতা মন্ডলী আল্লাহর ফযলে শুধু ইলম ও জ্ঞানের অধিকারীই নন, বরং আল্লাহ পাক আপনাদের অধিষ্ঠিত করেছেন দীনের নেতৃত্বের আসনেও। বিশেষতঃ এ 'মজলিস-ই ইলমী—যা আমাদের সমাবেশ ক্ষেত্র; এর গুরুত্ব সমধিক। আর তাই এ অবকাশে আমি দুটি মৌলিক তথ্যের ব্যাপারে সংক্ষেপে কিছু আরয করার কামনা রাখি।

এক ঃ আকাইদ—দীনের আদর্শ ও নীতিমালা এবং শরীয়তের মূল বিধি সম্পর্কিত বিষয়। এ ব্যাপারে আলিম সমাজ অবিচল থাকবেন হুবহু দিকদর্শন যন্ত্রের ন্যায়। ব্যক্তি যত অধিক প্রভাবশালী হোক না কেন, দিক দর্শন তার পরোয়া না করে নির্ভুল দিক নির্দেশ করবেই। শরীআতের মূলনীতি ও বিধিমালার ব্যাপারও অনুরূপ। এখানে অবকাশ নেই কোন প্রকার ঢিলেমী বা নমনীয়তার। হিকমাত ও কুশলতা ভিন্ন ব্যাপারে। আর শিথিলতা-নমনীয়তা ভিন্ন ব্যাপার। হিক্‌মাত ও মুদাহানাত কুশলতা ও শিথিলতার মাঝে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। সত্য কথাও তো মানুষ প্রজ্ঞা ও কুশলতার সাথে প্রকাশ করতে পারে। তবে তার পদ্ধতি অবশ্যই হতে হবে বিজ্ঞ কুশলতা সুলভ। আল-কুরআনে নির্দেশ রয়েছে ঃ

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"আহবান কর, তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে হিকমাত ও কল্যাণকর উপদেশের মাধ্যমে। [বণী ইসরাঈল—১১৫]।

কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, ঢিলেমী বা নমনীয়তা থাকবে। কারণ, ইরশাদ হয়েছে—

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

ওরা (কাফির সরদাররা) কামনা করে, তুমি একটু নমনীয় হলে (ঢিল দিলে) ওরাও নমনীয় হবে।” [কলম ঃ ৯]

কিন্তু তা করার অবকাশ নেই। এখানে আকীদা ও মূলনীতিতে আপোষ নেই। (আর এ জন্যই আমাদের শ্রেষ্ঠ আলিমগণকে গোঁড়া ও মৌলবাদী অপবাদ সইতে হচ্ছে।) আর আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি ঘোষিত হয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশ ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

“অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর, মুশরিকদের উপেক্ষা কর। [সূরা-হিজর-৯৪]

আয়াতের সমাপ্তি অংশ-‘মুশরিকদের উপেক্ষা কর’- দ্বারা আদিষ্ট বিষয় প্রকাশ্যে প্রচার-এর ক্ষেত্র নির্ণীত করা হয়েছে। অর্থাৎ—যেখানেই তাওহীদ ও শিরক আস্তিকতা ও একত্ববাদ এবং নাস্তিকতা ও অংশিবাদ পাশা-পাশি সীমান্তে অবস্থান করবে সেখানেই فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ অকুণ্ঠ বরং বলিষ্ঠ কণ্ঠে আদিষ্ট বিষয়ে প্রকাশ্য প্রচারের কর্তব্য পালন করতে হবে। উদারতা, নমনীয়তা, ও আপোষ রফা অন্য কোন ক্ষেত্রে হলেও হতে পারে, কিন্তু তাওহীদ সুন্নাত, শরীআতের সুস্পষ্ট ভাষ্য ও দীনের অকাট্য অখণ্ডনীয় বিষয় সমূহের বিধান হল বজ্র নির্ঘোষে প্রচার চালাও। ‘প্রকাশ্যে প্রচার কর’’ নির্দেশ যদি সার্বিক হত, অর্থাৎ তার সাথে কোন ক্ষেত্রের সংযুক্তি উল্লেখিত না হত, তাহলে তাতে ফাঁক ফোকিড়বের করার অবকাশ থেকে যেত। কিন্তু أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ “মুশরিকদের উপেক্ষা করে চল”—আয়াতাংশ তার স্থান ও পাত্রের স্পষ্ট তাফসীর ও ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছে। সুতরাং উলামা-ই-কিরামের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য তাওহীদের ব্যাপারে গোজামিল বিহীন, দ্ব্যর্থতামুক্ত পরিষ্কার কথা বলে দেওয়া। তবে তা হিকমতের সাথে হতে হবে অবশ্যই। তা যেন এমন না হয় যে (কবি গালিবের ভাষায়) کہتے ہیں وہ بھلے کی ولیکن بری طرح

“বলেতো তারা ভালোই; কিন্তু মন্দ করে-বলে’ বরং উত্তম কথা প্রকাশ করতে হবে উত্তম পদ্ধতিতে।

কখনো কোন ফিতনা কোন হাঙ্গামা দেখা দিলে প্রাথমিক পর্যায়ে আলিমগণ সযত্নে কোমল ভাষা ও কল্যাণকামীতার বাচনভংগী ব্যবহার করবেন, হিকমাত ও ধীরে চলার নীতি অবলম্বন করবেন। কিন্তু লক্ষ্যণীয় হবে যেন অপব্যাখ্যা বা ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ সৃষ্টি না হয়। মনীষীদের এ কুশলী কর্মপদ্ধতির সুফল স্বরূপ আজ পর্যন্ত এ দীন অবিকৃত বিদ্যমান রয়েছে। দুধ আর পানির মিশ্রণ ঘটেনি। খাঁটি ও ভেজাল ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে। এ পদ্ধতি অবলম্বনের পরেও কারো ধ্বংস হওয়ার স্বাধ জাগ্রত হলে, সে নির্বিঘেন তার স্বাধ পূরণ করুক। কিন্তু শরীআত ও তার বাহকদের দোষারোপ করার অবকাশ সে পেতে পারবে না। ইতিহাসের ব্যাপক ও সুগভীর অধ্যায়ন করলে জানা যাবে যে, এ উম্মাতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে একটি বছরও এমন অতিবাহিত হয়নি, যখন সার্বিকভাবে এ উম্মাত গোমরাহী ও বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিল। স্থানীয়ভাবে বিভ্রান্তি অনেক ঘটেছে, কিন্তু গোটা মুসলিম উম্মাহ কখনো সর্বব্যাপক ও সার্বজনীন গোমরাহীর শিকার হয়নি। হাদীছ শরীফেওতো রয়েছে—

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

“আমার উম্মত কোন ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে সমষ্টিগত ঐক্যমতে উপনিত হবে না।” এর প্রতিপক্ষে রয়েছে ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ। ইহুদীবাদতো তার সূচনাতেই বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার প্লাবনে ভেসে গিয়েছে। খৃষ্টবাদ তার শৈশব কাল থেকে চলতে শুরু করেছে রাজপথ ছেড়ে বাঁকা মেঠো পথ ধরে; শতাব্দীর পর শতাব্দী চলেছে তার সে বক্রগতি। পবিত্র কুরআন তাই খৃষ্টানদের আখ্যায়িত করছে ضالين ‘বিভ্রান্ত নামে। প্রথম চলার মুহূর্তেই সে ধরে ছিল ভিন্ন পথ। কিন্তু, আলহামদুলিল্লাহ—ইসলাম রয়েছে সুরক্ষিত। তাওহীদ ও শিরক এর পার্থক্য, সুন্নাত ও বিদআতের ব্যবধান, ইসলাম ও জাহিলিয়াতের ভিন্নতা এবং অমুসলিমদের জীবন ব্যবস্থা সভ্যতা সংস্কৃতি এবং ইসলামী জীবন বিধান ও তাহযীব তামা-দ্দুনের পার্থক্য আজো সুস্পষ্ট রয়েছে। কোন বিশেষ সময়ে কোন বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ কারণে কোন দেশ বা দেশবাসীর কোন ফিতনা চক্রান্ত-ষড়-যন্ত্রের শিকার হওয়ার কথা স্বতন্ত্র। সে ক্ষেত্রেও আলিম সমাজ নীরব

দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করেননি। বরং তখনও যথাসাধ্য শক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগে তার প্রতিরোধ তৎপরতায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তার ক্ষতিকর প্রভাব দূরীকরণ ও সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছেন। সার্বিক ভাবেই মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধিত করে ইরশাদ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۝

"ঈমানদারগণ! আল্লাহর জন্য দাঁড়িয়ে যাও ন্যায়ের সাক্ষ্য দাতা হিসাবে।" আমাদের ব্যবহারিক ভাষায় খোদায়ী ফওজদার' একটি কটাক্ষ সূচক শব্দ রয়েছে। এ ভাবে বলা হয় 'আপনি কি খোদায়ী ফওজদার যে এমন এমন ? (বাংলাদেশে এর নিকটবর্তী ব্যবহার রয়েছে ইসলামের ইজারা-দারী পেয়েছেন) কিন্তু قَوَّامِينَ لِلَّهِ (আল্লাহর অতন্দ্র প্রহরী কথাটি 'খোদায়ী ফওজদার এর প্রায় সমার্থ বোধক। قَوَّامِينَ শব্দটি মুবালাগাহ (অতি অর্থ জ্ঞাপক গুণবাচক বিশেষ্য) শব্দ রূপ 'খোদায়ী ফওজদার হওয়ার পদ মর্যাদাই প্রকাশ করছে। قَائِمِينَ لِلَّهِ (সাধারণ গুণবাচক বিশেষ্য) হলে এতখানি অর্থ হয়ত হত না। এখন আয়াতের অর্থ হল—কারো চাহিদা থাক বা না থাক কেউ সন্ধান করুক কিংবা না করুক কেউ আহ্বান করুক কিংবা না করুক, আপনাকে আপনার কর্তব্য পালন করেই যেতে হবে। আপনাকে সর্বত্র পেঁছে যেতে হবে। আয়াতে গোটা মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করা হয়ে থাকলেও আলিম সমাজের এ বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকবে যে, তাঁরা হবেন شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ হক ও সত্যবাদীতা, ন্যায় ও ইনসাফের সাক্ষী ও অতন্দ্র প্রহরী এবং পতাকাবাহী। মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব যদি হয় বিশ্ব জাতিসংঘের তত্ত্বাবধান ও পাহারাদারী করা; তাহলে আলিম সমাজের (অতিরিক্ত) দায়িত্ব হল ইসলামী উম্মাহ ও মুসলিম সমাজের তত্ত্বাবধান করা ও খোঁজ-খবর নিতে থাকা। এ দিকে লক্ষ্য রাখা যে উম্মাত ও সমাজ সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে হটে যাচ্ছে নাতো, সরল রেখা থেকে বিচ্যুত হচ্ছে নাতো। এ ক্ষেত্রে

তাদের দায়িত্ব বাতাসের গতি প্রকৃতি নির্ণয়ক 'ব্যারোমিটার' এর সাথে হুবহু তুলনীয়—যা যে কোন সময় যে কোন স্থানে বায়ু চাপ নির্দেশ করে। সব মওসুমেই বাতাসে গতি প্রকৃতির সঠিক সংকেত প্রদান করে।

মহাত্মনবর্গ ! আলিম সমাজের দ্বিতীয় কর্তব্য হল মুসলিম জনতাকে জীবনের বাস্তবতা, দেশের পরিস্থিতি এবং পরিবেশের পরিবর্তীতে চাহিদা সম্পর্কে খোঁজ খবর প্রদান করে তাদের সদা অবগত ও সতর্ক রাখা। আলিমদের প্রচেষ্টা সব সময় অব্যাহত থাকবে যেন পরিবেশ ও জীবনের গতির সাথে মুসলিম সমাজের সংযোগ বিছিন্ন না হয়ে যায়। কারণ চলমান জীবনের সাথে দীন এবং মুসলিম সমাজের সংযোগ বিছিন্ন হয়ে গেলে এবং খেয়ালী ও কাল্পনিক জগতে তারা বিচরণ করতে শুরু করলে দীনের আওয়ায তার প্রভাব ক্রিয়া হারিয়ে ফেলবে; আলিমগণ তাদের দা'ওয়াত ও (ইসলাহ সংস্কারের কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হবেন না। শুধু এ পর্যন্তই নয়,) বরং দীনের বাহকদের পক্ষে এ দেশে টিকে থাকা সুকঠিন হয়ে পড়বে। ইতিহাস আমাদের এ শিক্ষাই দেয় যে, সেখানে আলিমগণ অন্য সব কিছু করেছেন। কিন্তু উম্মতকে জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করেননি, পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করেননি, একজন সুনাগরিক ও রাষ্ট্র সমাজের একটি প্রয়োজনীয় ও ফলদায়ক অংগ রূপে গড়ে উঠার, দেশ ও জাতির নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেননি, সে দেশ সে সমাজ ও জাতি মুখের (বিস্বাদ) গ্রাস উগড়ে দেওয়ার মতই অমন লোককে উৎখাত করে দিয়েছে। উপড়ে দিয়ে দূরে নিক্ষেপ করেছে, কারণ তারা নিজেদের জন্য অবস্থান ক্ষেত্র ও টিকে থাকার ব্যবস্থা করে রাখেনি।

আজ উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য প্রয়োজন দূরদর্শী বুদ্ধি দীপ্ত, ও বাস্তবপন্থী ধর্মীয় নেতৃত্ব। আপনারা যদি মুসলমানদের শতকরা একশজনকেও মুত্তাকী পরহেযগার ও তাহাজ্জুদ আদায়কারী রূপে গড়ে তোলেন, আর পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক সংযোগ না থাকে, এবং তাদের এ খবর না থাকে যে, দেশ কোন রসাতলে যাচ্ছে। দেশ সমাজে চরিত্রহীনতা প্লাবন ও মহামারী আকারে বিস্তার লাভ করছে এবং দেশময় মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ছে, তাহলে ইতিহাস সাক্ষী যে, সেরূপ পরিস্থিতিতে তাহাজ্জুদতো দূরের কথা, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয আদায় করাই হয়ে পড়বে সুকঠিন। আপনারা যদি দেশের মাটিতে দীনদারদের নির্বিঘ্ন বসবাসের পরিবেশ সৃষ্টি করতে অসমর্থ হন, তাদেরকে এমন নিঃস্বার্থ, একনিষ্ঠ ও সুসভ্য নাগরিক রূপে প্রমাণিত করতে না পারেন—

যারা দেশ ও জাতিকে বিপথগামীতা থেকে রক্ষা করার জন্য সদা অস্থির থাকে এবং যারা রাখবে উন্নত ও আদর্শ অবদান, তাহলে মনে রাখবেন—যিকির আযকার ও নফল ইবাদাত সমূহ এবং দীনের আলামাত ও প্রতীক সমূহ রক্ষা পাওয়াতো দূরের কথা, আল্লাহ না করুণ এমন সময়ও আসতে পারে যে মসজিদ গুলি বিদ্যমান থাকাও কঠিন হয়ে পড়বে। মুসলমানদের পরিবেশ ও বৃহত্তর সমাজ থেকে বিছিন্ন ভিনদেশী বানিয়ে রাখলে জীবনে বাস্তবয়তার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে থাকলে এবং দেশের বুকে সংঘটিত পরিবর্তন সমূহ সম্পর্কে নতুন নতুন জারিকৃত বিধান ও আইন কানুন সম্পর্কে অজ্ঞাত রাখলে জনজীবনে ও জনতার মেধা-মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তারকারী অনুভূতি সমূহের বিষয়ে উদাসীন থাকলে তার পরিণতি হবে এই যে, নেতৃত্ব দেওয়া (যা উম্মাতের জাতীয় কর্তব্য) তো পরের কথা তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করাই হবে কঠিনতম চালেঞ্জ। মিসর বিজয়ী সাহাবী হযরত আমুর ইবনুল আস্ (রাঃ)-এর ঈমানী তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সম্ভবতঃ এ কথা প্রতিভাত হয়েছিল যে, সদ্য বিজিত এ মিসর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বরং হাজার হাজার বছর ইসলামের ছায়ায় পরিচালিত হবে। কারণ, তিনি দেখলেন যে, ইসলামের কেন্দ্রভূমি পবিত্র হিজায মিসরের নিকট দূরত্বে অবস্হিত। আর রোমান সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত হয়েছে, কিবতী (ফির'আওনের বংশধর ও অনুসারী) খৃষ্টানদের রাজত্বও শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং মিসর আজ থেকে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য ইসলামী বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তিনি আরবদের এবং মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন—'তোমরা প্রতি মুহূর্তে সীমান্ত রক্ষায় এবং যুদ্ধের ময়দানে রয়েছে। তোমরা হবে অতন্দ্র প্রহরী। এক পলকের জন্য চোখ বন্ধ করলে মৃত্যু অবধারিত। সীমান্ত চৌকীতে অবস্হানকারী সিপাহীকে প্রতি মুহূর্তে সজাগ সতর্ক থাকতে হয়। কোন প্রকার উদাসীনতা অসতর্কতা তার জন্য অমার্জনীয় অপরাধ এবং ঢিলেমী ও অবহেলা কিংবা অসতর্কতার অভিনয়ও মুহূর্তে ঘটাতে পারে তার করুণ পরিণতি।

সুধীমন্ডলী! যে দেশের বুকে আমরা এখন আমাদের জীবন অতি-বাহিত করছি, সে দেশটির পরিস্হিতি দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। এ দেশটি বড় হলেও সে তার প্রতিবেশী দেশ সমূহ এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রভাব হতে বেপরোয়া হতে পারে না এবং পারিপার্শ্বিকতার উর্ধ্বেও উঠতে পারেনা। এদেশে এখন চলছে নিত্য নতুন আদর্শের পরিক্ষা-নিরীক্ষা। অনেক নেতিবাচক শক্তি ও ধ্বংসাত্মক আন্দোলন মাথা নাড়া দিয়ে উঠছে এবং তারা অতিশয় তৎপর ও অতি তরিৎ কর্মা। শিক্ষা ব্যবস্থায় চলছে অহরহ রদবদল, কখনো তা তীব্র আঘাত হানছে দীন আকীদা এর মূল-

ভিত্তি সমূহের। বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন এবং রাষ্ট্রীয় ভাষার বিষয়টি নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটিয়েছে। এহেন অবস্থায় অব্যাহত ভাবে পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করতে থাকা আমাদের কর্তব্য। আত্মরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করতে থাকা আমাদের দায়িত্ব।

উল্লেখিত কর্তব্য পালনের সাথে সাথে মুসলমানদের অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল করে তাদের বলে দিন যে, এ দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা তোমাদের কর্তব্য। তোমরা ঈমানদার আমানতদার হয়ে, নীতিবান হয়ে দেশ ও জাতির জন্য কাজের লোক হয়ে এ মাটিতে অবস্থান কর। তোমরা এখানে উপস্থাপিত কর হযরত ইয়ুসুফ আলাইহিস্সালামের দৃষ্টান্ত। তাহলে এমন সময়ও তোমাবের সামনে উপস্হিত হবে, যখন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, অধিকতর সংগীন ও অধিক জটিল দায়িত্ব সোপর্দ করা হবে তোমাদের হাতে। আল্লাহ পাক ইয়ুসুফ আলাইহিস্সালামকে বিশেষ দু'টি গুণ দান করেছিলেন—সংরক্ষণ সততা ও বিষয় অভিজ্ঞতা। তিনি গভীর ভাবে লক্ষ্য করলেন যে, মিসর ও তার বাসিন্দাদের যা অবস্থা তাতে নিজের যোগ্যতা-দক্ষতা, কল্যাণ কামীতা, মানব প্রেম ও ন্যায় পরায়ণ-তার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত এবং আল্লাহর বান্দাদের নিজের প্রতি আগ্রহী করে তোলার পূর্ব পর্যন্ত এ দেশে এ মাটিতে দীনের প্রচার এবং দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরী হতে পারে না। বরং ক্ষেত্র-পরিবেশ সৃষ্টি না করে এক আল্লাহর নাম উচ্চারণ করাও হবে ভয়াবহ ব্যাপার। তিনি অসীম দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকলেন লক্ষের দিকে। আমরা যারা এখানে মুসলমান রূপে বাস করছি, আমাদেরও প্রমাণ করে দিতে হবে যে, এদেশ এ সমাজ আমাদের বাদ দিয়ে চলতেপারে না। আমাদের অনুপস্হিত এদেশকে করে দেবে ধ্বংসের মুখোমুখি।

মনে রাখবেন, আমরা যদি দেশের পরিস্হিতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখি এবং তাতে প্রবাহিত অনুকূল-প্রতিকূল ও উষ্ণ শীতল বায়ুর ব্যাপারে উদাসীন হয়ে থাকি। আমরা যদি উষ্ণতা আদ্রতা মুক্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসস্থানের কল্পনা বিলাসে গা ভাসিয়ে দেই এবং তাতে জীবনকে নির্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত মনে করতে শুরু করি, তা—হলে মনে রাখবেন, আমরা নিজেরাই নিজেদের অকল্যাণ ডেকে আনব। নিজেদেরই ঘটবে আত্মাহুতি সাথে সাথে দীনেরও অপুরণীয় ক্ষতি সাধন হবে। কেননা, কোন দল উপদল, দেশের বাসিন্দাদের একটি অংশ অপরা-পর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টিকে থাকতে পারে না।

তবে বৃহত্তর জীবন ধারার সাথে সংযোগ রক্ষা অবশ্যই শর্ত সাপেক্ষ এবং তার জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট সীমানা ও চৌহদ্দি। আমি বলছি

না যে, আপনারা তরলীভূত হয়ে আপনাদের সত্ত্বা বিলীন করে দেন, বরং আপনারা অবিচল থাকুন আপনাদের পয়গম ও বিশ্বজনীন দাওয়াত প্রচারে। আপনারা টিকে থাকুন আপনাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে, আপনারা পূর্ণ মাত্রায় ধরে রাখুন আপনাদের ধর্মীয়-জাতীয় স্বাতন্ত্র, তার ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ বর্জনেও আপনারা কঠিন ভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করুন! কিন্তু বৃহত্তর জীবন' প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন না। আমি 'জাতীয় জীবন' স্রোতের কথ্য বলছি না। আল্লাহ না করুন, জাতীয় ধারায় বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা যেন কোন দিনই আমার মুখ থেকে না বেরোয়। একবারও না। আমি বলছি—আপনারা 'জীবন স্রোত' থেকে হারিয়ে যাবেন না। কারণ, জীবনের গতিধারা থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়, তারা হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল তলে। জীবন-ধারীদের মাঝে তার অধিকৃত কোন স্হান থাকে না। ইসলামকে আমি এত সংকীর্ণ গন্ডিবদ্ধ ও অপূর্ণাংগ বিশ্বাস করতে পারি না যে, পরিস্থিতি ও জীবনের বাস্তবতার দিকে মনযোগ দিলেই ফরয ওয়াজিব অনাদায়ী থেকে যাবে, 'আকীদা ও মৌলিক আদর্শ'' বিশ্বাসে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। আমা-দের বুযুর্গ পূর্ব সুরীগণ শাহানশাহী পরিচালনা করেছেন, সাম্রাজ্যের কর্ণধার হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের তাহাজ্জুদে পর্যন্ত অনিয়ম দেখা দেয়নি। কোন সাধারণ ক্ষুদ্র সুন্নাতও বর্জন করতে হয়নি। হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর ঘটনা শুনুন। তিনি তখন ইরাকের রাজধানী-মাদায়েনে অবস্থান করছেন। একদিন খাবার কালে খাদ্যের কিছু অংশ মাটিতে পড়ে গেলে তা সযত্নে তুলে নিয়ে পরিচ্ছন্ন করে তিনি খেয়ে ফেললেন। কেউ বলে উঠল—আরে, আপনি গভর্নর হয়েও এমন করছেন? এতে যে ইজ্জত যায়। তিনি কি জবাব দিয়ে ছিলেন? তিনি বললেন—তোমাদের মত আহমক নির্বোধদের খাতিরে আমি আমার হাবীব প্রিয়তমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাত ছেড়ে দেব?

ব্যাপার এমন নয় যে, আগুনের উপস্থিতিতে পানি থাকতে পারবে না আর পানি এসে পড়লে আগুন নিভে যাবে। এ ধারণা ভ্রান্ত। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অবিচলতা তাক্ওয়া নীতি ও অধিক ইবাদতের মাধ্যমেই একজন মানুষ সফল সুনাগরিক হতে পারে। আমি তো মনে করি, যারা বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর ইবাদত করে এবং নীতি কর্তব্যে নিয়মানুবর্তী হয়; তারাই হতে পারে শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর নাগরিক।

আজকের দিনে শুধু ভারতই নয়, সবগুলি সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম দেশ এমনকি আরব দেশ সমূহের অবস্থাও অনুরূপ। ইউরোপ আমেরিকার

উষ্ণ হাওয়ার ঝাঁপটা লেগেছে সর্বত্র। মাথা চাড়া দিচ্ছেন নতুন নতুন ফিতনা হাংগামা। সংঘাত সংঘর্ষ চলছে ইসলাম ও জাহিলিয়াতের। পরবর্তী যুগে নতুন নতুন চাহিদা এবং জীবন ধারায় নতুন নতুন সমস্যা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। সেসব দেখেও না দেখা এবং 'ওসব কিছু নয়, বলা নিতান্তই ভুল। বাস্তবতাবোধ, উদার দৃষ্টিভংগী ও সার্বজনীনতার প্রমাণ পেশ করার প্রকৃষ্ট ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবকাশ রয়েছে হায়দারাবাদে। এখানে রয়েছে ইল্ম ও শিক্ষার প্রসার, আমল ও কর্ম অবদানের প্রেরণা। এখানে স্হাপিত হচ্ছে নতুন নতুন সংস্থা সংগঠন, জন্ম নিচ্ছে নীতি ও দাওয়াতী আন্দোলন। কিন্তু মুসলমানদের মৌলিক অভাব রয়েছে সামগ্রিক নেতৃত্বের। তাদের প্রয়োজন রয়েছে নির্ভুল পরামর্শের। আমাদের করণীয় বিষয় দু'টি। এক, আকীদা, ও ধর্ম বিশ্বাস, নীতি ও আদর্শ এবং শরী'আতের অপরিহার্য অকাট্য বিধান মালার ব্যাপারে পাহাড় তুল্য অবিচলতা ও ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা। দুই, জীবনের বাস্তব সমস্যাবলীর ব্যাপারে পূর্ণ উপলব্ধি, পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা, সম্পূর্ণ সচেতনতা ও ভরপুর সমবেদনা। এ দু'য়ের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হলে—ইনশাআল্লাহ বিপদ সংকুল পরিস্থিতিতো কেটে যাবেই, সেই সাথে একান্ত আশা করা যায় যে, স্বয়ংক্রিয় ভাবে আপনাদের নাগালে এসে যাবে এ দেশের নেতৃত্ব।

মুসলমানদের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনা এবং নাগরিক কর্তব্যবোধ (Civil Sence) জাগ্রত করুন। যে গ্রাম মহল্লা, যে বস্তীত তারা বসবাস করবে. সেখানে পরিদৃষ্ট হবে অনন্য স্বাতন্ত্র। যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে যে, এটা মুসলমানদের মহল্লা, এগুলি মুসলমানদের বাড়ীঘর। দীনের প্রকৃত রূহ্ ও জীবনী শক্তি এবং তার বাহ্যিক প্রতীক আবরণ সমৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের করণীয় হচ্ছে কর্তব্য সচেতন নাগরিক জীবন যাপন, মানবতা প্রেম, বাস্তবতার উপলব্ধি, বুদ্ধিমত্তা, দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা। বিপদ মুহূর্তে দেশ রক্ষা এবং দেশের খিদমতে আত্মনিবেদন ও বিপদ বরণ করে নেওয়া। আপনরা (আলিম সমাজ) এ বিষয়ে আদর্শ হোন; মুসলমানদের তৈরী করুন দৃষ্টান্ত ও আদর্শ রূপে।

وصل الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله
وصحبه وسلم

অনৈসলামী প্রথা বর্জন অত্যাবশ্যকীয়

[হায়দারাবাদের মীর আলম পুকুর এলাকায় অবস্থিত জামিয়া' আরাবিয়া দারুল উলমে সমবেত উলামা' মাদরাসা শিক্ষকবৃন্দ, আরবী শাখার ছাত্র এবং শহরের মান্য-গণ্য ব্যক্তিবর্গের সমাবেশে ১৯৮২ ইং ১৪ই অকটোবর সকাল দশটায় এ বক্তৃতা হয়। একজন কারী সাহেব উদ্বোধনী কিরাত তিলাওয়াত করলেন। তবে লক্ষ্যণীয় যে, কারী সাহেব সভা-সমাবেশে সাধারনভাবে প্রচলিত পঠিতব্য কিরাত তিলাওয়াত না করে সূরা বাকারার ১০৪—১০৫ আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا ...

এ যেন ছিল গায়েবী ইশারা। অতিথি বক্তা আয়াতদ্বয়ের আলোকে হায়দারাবাদের তখনকার পরিস্থিতির উপযোগী প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার অবকাশ পেয়েছিলেন। হায়দারাবাদে প্রচলিত কুপ্রথা কুসংস্কারগুলির মাঝে তখন 'চামর দোলা মিছিল' নিয়ে মাযারে ওরশ পালন করার হিড়িক চলছিল, এবং এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের রূপ ধারণ করেছিল। বক্তা আয়াতের আলোকে মুসলমানদের জন্য অনুকরণ বর্জনের অপরিহার্যতা ও গুরুত্ব ব্যক্ত করেন।

এ সমাবেশে উদ্বোধনী বক্তৃতা করেছিলেন দারুল উলুমের বিল্ডিং ফান্ড কমিটির সভাপতি এবং 'রাহনুমা-ই-দাকান' (দাক্ষিণাত্য দিশারী) পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর জনাব সাইয়্যিদ লাতীফুদ্দীন কাদির সাহেব।]

হাম্‌দ ও সালাত :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا

وَاسْمَعُوْا وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ○

সুধীবৃন্দ,

আজকের মজলিসের কারী সাহেব এ আয়াত তিলাওয়াত করেছিলেন। আমিও তা তিলাওয়াত করলাম। আয়াতের সহজ সরল অর্থ হল— হে ঈমানদার লোকেরা رَاعِنَا (রাইনা) শব্দ বলবে না, انْظُرْنَا (উন-

যুরনা) বলবে এবং মনোযোগের সাথে নবীর কথা শুনবে। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।'' আমাদের জেনে রাখা কর্তব্য।; আর যাদের জানা রয়েছে. তাদের তা সজীব রাখা বাঞ্ছনীয় যে, এ আয়াত কোন পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিল, আমাদের কাছে তার দাবী কি ? এবং তাতে আমাদের জন্য রয়েছে কি পয়গাম ?

راعنا, আরবী ভাষার বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল শব্দ। অর্থ—আমাদের দিকে একটু লক্ষ্য দিন। (শ্রোতাদের প্রতি) একটু অনুগ্রহ মনোযোগ দিন। আবার انظرنا ও আরবী ভাষার বিশুদ্ধ-প্রাঞ্জল শব্দ। যার অর্থ— আমাদের জন্য ক্ষণিক অপেক্ষা করুন, কথাটি শুনে বুঝে নেওয়ার মত বিরতি-অবকাশ আমাদের দিন। দুটি শব্দ আরবী ভাষার প্রচলিত শব্দ নিখুঁত শব্দ। কিন্তু ব্যাপার কি? আল্লাহ পাক একটি শব্দ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত তিলাওয়াত চলবে যে মহান কিতাবের, তাতে এ শব্দ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত হচ্ছে। শুধু কি তা-ই? প্রাথমিক যুগ শেষ হল। কুরআন শরীফের তিলাওয়াত শুরু হল এমন সব দেশেও 'আরবী যাদের মাতৃভাষা নয়, আরবী সেখানে কথ্য-লেখ্য ভাষা নয়। কিন্ত আপাতঃ বিচারে এ ক্ষুদ্র বিষয়ের নিষেধাজ্ঞাকে এত গুরুত্ব প্রদান করা হলে যে, কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের দেশে দেশে পঠিতব্য কুরআন বহু ভাষায় তরজমা-অনুবাদ হবে যে কুরআনের-তাতে স্থান দেয়া হল এ নিষেধাজ্ঞাকে। কিন্তু কেন ? বিষয়টি ভেবে দেখার উপযোগী। শব্দটি কি অপরাধ করেছিল যে তাকে অপাংক্তেয় ঘোষণা করে তারই সমার্থক অন্য শব্দ লিখিয়ে দেয়া হল— এটা বলবে, ওটা বলবে না। উচ্চারণেও বিধি নিষেধ।

মূল ব্যাপারটি মনস্তাত্বিক। পৃথিবীর বুকে যে ব্যক্তি, যে দল বা জামা'আতের নির্যাতীত নিপীড়িত হওয়ার অভিযোগ থাকে, যারা অবিচারের শিকার মনে করে নিজেদের এবং হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয়, তারা উপহাসমূলক ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে এবং কথার তুবড়ী দিয়ে মনের ঝাল মেটাতে চেষ্টা করে, এতে তারা কিঞ্চিত প্রবৃত্তি-সুখ উপভোগ করে তাতে মনকে সান্তনা দেয়। উরদু ভাষায়ও এ ধরনের নিষ্পাপ শব্দ রয়েছে যা বাহ্যতঃ গাম্ভির্যপূর্ণ ও অর্থবহ। কিন্তু নিকৃষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন 'আপনি তো বড় উস্তাদ' (বেশ ভদ্রলোক।) (আমার লাখনৌ বসবাসের সুবাদে এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে।)

নবী আলাইহিস্ সালামের দরবারে ইহুদীদের নিয়ম ছিল, কোন আলোচনা শুরু হলেই তারা অতি আগ্রহ দেখিয়ে বলত راعنا (আমাদের প্রতি একটু দৃষ্টি দিন, কথাটি বুঝে নেয়ার সুযোগ দিন) কিন্তু তারা এ শব্দটি একটু টান সহ চিবিয়ে উচ্চারণ করত। যার ফলে শব্দটি راعينا হয়ে যেত। যার অর্থ হল 'আমাদের রাখাল। পরিচ্ছন্ন মন ও মেধার লোকদের মন এ অর্থের দিকে ধাবিত হত না যে, এখানে রসিকতা ও উপহাস করা হচ্ছে। ইহুদীদের এ আচরণের কারণ ছিল এই যে, তাদের ধারণা মতে ইসরাঈল অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর ব্যতীত পৃথিবীর অপর সব জাতির লোকেরা ছিল তৃতীয় শ্রেণীর এবং পশু ও জড়বস্তু তুল্য। অ-ইহুদীদের জন্য আজও তাদের ভাষায় অ ইহুদীদের উদ্দেশ্য প্রয়োগ করার জন্য (Gentile) শব্দের অর্থ বিদ্যমান রয়েছে যার অর্থ ধর্মহারা বা 'ম্লেচ্ছ'। তারা বিশ্বাস করত এবং দাবী ও করত যে, উম্মী ও নিরক্ষর (আরববাসী) দের সাথে যে কোন ধরনের আচরণ বৈধ। তাদের সাথে মিথ্যা বলা অপরাধ বা মিথ্যা নয়। তাদের কোন জিনিস আত্মসাত করা চুরি নয়। তাদের নির্যাতন করাতে পাপ নেই। এই মনোভাব উল্লেখিত হয়েছে তাদের দাবী মক্কীয় আল-কুরআনে। এই আয়াত তারা বলত:

لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّيْنَ سَبِيْلٌ

—"উম্মীদের ব্যাপারে আমাদের কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ হবে না।

সাহাবা-ই-কিরামের সরল মনে তাদের এ দুরভিসন্ধি ধরা পড়েনি। কিন্তু আল্লাহ পাকতো সর্বজ্ঞ ও মহাবিজ্ঞ; তিনিতো 'লাহ্‌নুল কাওল' কথার সুর ও ভংগীর গুপ্ত উদ্দেশ্যও জানেন। সুতরাং চিবিয়ে চিবিয়ে অস্পষ্টতা, আঞ্চলিকতা বেশ ধরে টেনে টেনে শব্দ উচ্চারণের বিশেষ অর্থ সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত। আল্লাহ পাক সাহাবীগণকে পথ নির্দেশ করলেন যে, আরবী ভাষার শব্দ সম্ভারে ঐ অর্থ প্রকাশ এ একটি মাত্র শব্দে সীমিত নয়; কাজেই তোমরা راعنا না বলে انظرنا বলবে কেননা, দ্বিতীয় শব্দটিতে কোন রূপ দ্ব্যর্থতার অবকাশ নেই।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, একটি মাত্র শব্দের ব্যাপারেও আল্লাহ পাক সতর্কতা অবলম্বনের শিক্ষা দিচ্ছেন, যাতে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি না হয় এবং মুসলমানদের মুখ থেকে এমন কোন শব্দ উচ্চারিত না হয়, যা নবুয়তের যথাযথ মর্যাদার উপযোগী নয়। তাহলে অমুসলিমদের আচার-আচারণ ও প্রথা-প্রতীক যাতে তাদের বিশ্বাস দেব-দেবী ও পৌত্তলিক দর্শন প্রতিবিম্বিত হয়, তা অবলম্বন কিভাবে বৈধ হতে পারে? আয়াতখানি আল-কুরআনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে হওয়ার পেছনে নিহিত রহস্য ও হিকমাত এটাই। বিগত রমযানে আপনাদের তারাবীহ্ সালাতেও এ আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছে। তা থেকে গেলে কুরআনের খতম পূর্ণাংগ হত না এবং ভুলে থেকে গেলে শেষ দিকে পড়ে নেওয়ার কড়া তাগিদ দেয়া হত।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এ ঘটনা ও নির্দেশের পক্ষদ্বয়, ইহুদী এবং মহান আনসার মুহাজিরগণের যুগতো আর এখন নেই, সুতরাং এখনও তার বিধান অব্যাহত বিদ্যমান থাকার হিকমাত ও ফায়দা কি? জবাবে আমি বলব, এর রহস্য ও উদ্দেশ্য হল স্থায়ীভাবে এ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা যে, কোন ভিন জাতির কূট অস্ত্র রূপে ব্যবহৃত একটি শব্দ ব্যবহার করাই যখন নিষিদ্ধ হল, তাহলে ভিন্ন জাতির নিজস্ব আচার-প্রথা তাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশক প্রতীক আচরণ সমূহ গ্রহণ করা অনুমোদিত হতে পারে? অতএব, এ যুক্তি গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না যে, অন্যরাতো শোভা যাত্রা মিছিল করে তাদের ধর্মীয় জাতীয় জাঁকজমক ও প্রতিপত্তি প্রকাশ করে থাকে, তাহলে আমাদেরও অনুরূপ অনুষ্ঠান করা উচিত। ওরা মন্দির উৎসবে পতাকা তোলে, তাই আমাদেরও পাংখা মিছিল (চামর-দোলা) নিয়ে মাযারে ওরশ করা উচিত। হযরত উমার (রাঃ)-এর প্রশংসায় ইরশাদ হয়েছে—'উমার (রাঃ) যে রাস্তায় পথ চলে শয়তান সে রাস্তা ত্যাগ করে অন্য পথ ধরে।' আমাদেরও শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। যাতে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ থেকে আমরা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হই এবং তাওহীন ও সুন্নাত অনুসরণের পথ থেকে আমাদের পদস্খলন না ঘটে; আমরা ভিন্ন কোন সীমান্তে তাড়িত না হই। মাত্র একটি শব্দের ব্যাপারেও যদি আল্লাহ পাকের গায়রাত ও মর্যাদাবোধে কম্পন সৃষ্টি হয়ে এবং হাজার হাজার বছর ধরে ব্যবহৃত ও আজ পর্যন্ত অভিধান ব্যবহারে বিদ্যমান (রায়েনা) শব্দটির ব্যবহার মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হতে পারে, তাহলে অমুসলিমদের এবং জাহিল জাতিসমূহের রীতি ও প্রথা প্রতীক গ্রহণ করে তাদের অন্ধ অনুকরণ ও তাদের সাথে একাত্মতা দেখানো আল্লাহ পাকের অসীম মর্যাদাবোধ কম্পিত হয়ে উঠবে না কি?

ভারতের অমুসলিম বাসিন্দাদের ধর্মীয় বন্ধন শিথিল বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর ধর্ম ও সমাজের সংযোগ টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের ধর্ম ও সমাজ নেতারা এ সব না করলে তাদের ধর্ম ও সমাজের মাঝে সংযোগ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। তাদের সমস্যা বা উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের দাসত্বের স্বীকৃতি বা তার পূজা করার নয়। তাদের সমস্যা হল, হিন্দু ধর্মও একটা ধর্ম, কিন্তু তার পরিচয় দানের উপায় কি? এ উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন পূজা পার্বণ ও অনুষ্ঠান শোভাযাত্রা আবিষ্কার করেছে। রামলীলা, দশরা, হোলী, দেয়ালী এবং বাংলাদেশে দুর্গা, কালী, সরস্বতী পূজা ও দাক্ষিণাত্যের গণপতি পূজা উৎসব এ সবই ঐ উদ্দেশ্যে রচিত।

পক্ষান্তরে ইসলাম একটি প্রাণবন্ত ও সজীব ধর্ম। তার রয়েছে প্রাণ-শক্তি, স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ও জীবন্ত রীতি-নীতি ও প্রতীক। এ সবের সঠিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে একটি ঘটনা থেকে। একদিন জনৈক ইয়াহুদী আলিম হযরত উমার (রাঃ)-এর খিদমতে নিবেদন করলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবে (আল-কুরআন) এমন একখান আয়াত রয়েছে, যা আপনারা অহরহ তিলাওয়াত করে থাকেন; তেমন আয়াত যদি আমাদের ইয়াহুদীদের জন্য নাযিল হত, তা হলে (নাযিল হওয়ার) সে দিনটিকে আমরা ঈদ ও উৎসব দিবস হিসাবে স্থির করতাম[১] হযরত উমার (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন সে কোন আয়াত? ইয়াহুদী আলিম বললেন:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম তোমাদের দীন, পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের জন্য আমার নি'মাত এবং মনোনীত করলাম 'ইসলামকে তোমাদের দীন রূপে।" [সূরাঃ মায়িদাহঃ ৩]

ইয়াহুদী আলিম জানতেন যে, ইয়াহুদী ধর্ম ও শরী'আতের ইতিহাসে 'অমুক ইসরাঈলী (ইয়াহুদী) নবীর মাধ্যমে নবুয়তের সমাপ্তি রচিত হল" এমন কোন ঘোষণা নেই। কারণ, বাস্তব ব্যাপার হল এই যে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন আসমানী দীনে এ রূপ ঘোষণা বিদ্যমান নেই যে, 'এখন দীন পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে।" বিগত সব জাতি ও ধর্ম তাদের এ শূন্যতা প্রকট ভাবে অনুভব করত। কেননা, নিত্যদিন তাদের কাছে কোন না কোন নবুয়-

১. বুখারী শরীফ, কিতাবুত তাফসীর।

তের দাবীদার এসে তার নবী হওয়ার দাবী করে বসত। ইয়াহুদী খৃষ্টান ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতদের তাদের রচনা নিবন্ধে এ আকুতি উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায় যে, একি ঝামেলা হল, এ কোন বিপদ, নিত্য নতুন নবীর উদ্ভব হচ্ছে। আর খৃষ্টান ইয়াহুদী জন সমাজ চরম বিভেদ বিশৃংখলায় ছিন্ন ভিন্ন হচ্ছে, নিত্য নতুন সমস্যা গজিয়ে উঠছে। তাই, আয়াতের উল্লেখ করে ইয়াহুদী আলিম বলতে চেয়েছিলেন যে, আল্লাহ পাক আপনাদের (মুসলমানদের) এত বড় ও মহান নি'য়ামাত দান করেছেন, যার ফলে চিরদিনের জন্য বিশৃংখলা ও নিত্য দিনের ঝগড়া কলহের বিলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু আমাদের বিস্ময় হল, যে আয়াত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিল এবং যার মাধ্যমে এ অভূতপূর্ব নিয়ামাত আপনাদের ভাগ্যে নির্ধারিত হল তা আপনাদের উৎসব দিবসে পরিণত হল না কেন?

হযরত উমার (রাঃ) ইয়াহুদী আলিমকে এমন সরল সহজে জবাব দিলেন, তা কোন দীনের তত্ত্ববিদ ও সরাসরী নববী দরবারের শিক্ষাংগণে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিজ্ঞজনের পক্ষেই সম্ভব। তিনি বললেন: আমরা উত্তম রূপে অবগত রয়েছি যে, এ আয়াত কখন কোথায় (কি পরিস্থিতিতে) নাযিল হয়েছিল। জিলহজ্জ মাসের নয় তারিখে আরাফাতে নাযিল হয়েছিল এ আয়াত।

হযরত উমার (রাঃ) এর জবাব ছিল এতটুকুই। এ জবাবের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক: ঐ দিনটি আগে থেকেই 'ঐতিহাসিক সারণীয় দিবস; বিশ্ব মুসলিম সে দিন ইবাদাত করে থাকেন একত্র সমাবেশে। অতএব নতুন করে এটিকে উৎসব দিবস ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা নেই। দুই: আয়াত যেদিন-ই নাযিল হয়ে থাক এবং তার বিষয়বস্তু যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, আমরা তাকে উৎসবে পরিণত করতে পারি না। কেননা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী উম্মাতের জন্য দু'টি ঈদ সাব্যস্ত করে দিয়েছেন—ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য আল্লাহ পাকের মনোনীত ও অনুমোদিত উৎসব দিবস ঐ দু'টিতেই সীমিত। সুতরাং অন্য কোন উৎসব প্রামাণ্য ও শরীআত সম্মত হতে পারে না। তা ছাড়া মুসলমান ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের ঈদ পার্বণে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। অমুসলিমদের উৎসব পার্বণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধুমধাম, রং তামাসা, রংগলীলা ঠাট্টা উপহাস ও লজ্জা শরমের আবরণ তুলে রেখে যা ইচ্ছা তাই করার অবাধ স্বাধীনতা। যাতে সৃষ্টি কর্তা আল্লাহকে ভুলে যাওয়াতো রয়েছেই অনেক ক্ষেত্রে উৎসবামোদীরা আত্মহারা হয়ে

সভ্যতা-নৈতিকতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইসলামী উৎসবের (দুই ঈদ) অবস্থান হল এই যে সাধারণ সময় যে চাশ্‌ত এর সালাত ফরয ওয়াজিবতো নয়-ই, সুন্নাতে মুআকুকাদাহও ছিল না। দুই ঈদের দিনে সে চাশ্‌ত এর সময় দুরাকাত সালাত বিধিবদ্ধ করে দেয়া হল, এবং তাকে সুন্নাতে মুআককাদাহ (বা ওয়াজিব) সাব্যস্ত করা হল। আর শুধু তাই নয়, নিত্যকার সালাতের দুই তাকবীর—তাহ্‌রীমাহ ও রুকুর তাক্‌বীরের স্থলে তিন তাকবীর বাড়িয়ে দিয়ে দুই রাকআতে অতিরিক্ত ছয় বার তাকবীরের বিধান দেওয়া হল। এ এক মজার ব্যতিক্রমী উৎসব। ইবাদত ও সালাত বাড়িয়ে দেওয়া হল, সালাতের তাকবীরও বাড়ানো হল তদুপরি খুতবা বর্ধিত হল। এ হচ্ছে ইসলামী উৎসবের বৈশিষ্ট ও প্রকৃতি।

হযরত উলামা-ই-কিরাম আপনারা একটি দীনি প্রতিষ্ঠান তথা একটি বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক ওছাত্র সমাজ। আপনাদের দায়িত্ব এ বিষয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা এবং এর তত্ত্বাবধান করা যে মুসলমানরা إمعة (বিজাতীয় সাংস্কৃতি অনুসরণ কারীদের) দলে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে না তো ? মনে রাখবেন, إمعة বলার চাইতে إمعة করায় লিপ্ত হওয়া আরও ভয়াবহ ও মারাত্মক। সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে অমুক দল সম্প্রদায় অমুক অনুষ্ঠান শোভাযাত্রা করছে তাহলে পাল্লা ব্যবস্থা হিসাবে আমাদের ও অমুক অনুষ্ঠান আড়ম্বর করতে হবে এ ধরনের মনোভাব ও চিন্তাধারা যেন মুসলমানদের পেয়ে না বসে কেননা এ চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি إمعة বলার চাইতেও নিকৃষ্টতর। কারণ। إمعة তো একটি মাত্র শব্দের ব্যাপার যা ইথারে ভেসে যায়। কিন্তু অমুসলিমদের নকল অনুকরণে কোন অনুষ্ঠান পার্বণ করা হলে তা তো আমলী ও বাস্তব إمعة হয়ে যাবে। তার প্রতিক্রিয়া বিস্তৃত হবে আকীদা আমল, তাহযীব, তামাদ্দুন, সভ্যতা, সংস্কৃতি সমাজ জীবন সব ক্ষেত্রে। দুষ্ট ক্যান্সার রূপে এর বিষক্রিয়া ছড়িয়ে যাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সমাজ ক্ষত বিক্ষত হবে মহামারীর আঘাতে। তাই আলিম সমাজের কর্তব্য হল যখনই সমাজ জীবনে কোন বিদ্‌আত কোন গর্হিত আচার-অনুষ্ঠান এবং অমুসলিম অনুকরণের কোন অবস্থা মাথা চাড়া দিতে শুরু করে, তখনই এর প্রথম মুহূর্তে তাতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা। তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দিবেন যে, এ ধরনের আচার-অনুষ্ঠনের সাথে ইসলামের কোন সংযোগ নেই, ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ গর্হিত, তা ইসলামের রূহ ও আত্মার এবং ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্হী। দরগা মাযার গুলিতে আজ যা কিছু হচ্ছে তার অধিকাংশেই অমুসলিমদের অনুকরণ প্রসূত। ঐ সব কুপ্রথা ও বিদ'আতের ইতিহাস ঘাটলেই দেখা যাবে যে, কবে কোন পরিস্থিতিতে এর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং এর পিছনে কার্যকর উৎস কি ছিল।

দীনের রূহ হচ্ছে ইবাদাত, দীনের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়ে তাঁর সমীপে আত্মসমর্পণ; দীনের মূল মন্ত্র হচ্ছে তাওহীদ। দীনের সজীবতা হচ্ছে সারল্য। দীনের রূহ ও আত্মা হচ্ছে এমন বিষয় ও কর্ম যা দ্বারা প্রতিপালনকারী নিজেও উপকৃত হতে পারে এবং সমাজের অন্যান্যদেরও উপকার পৌঁছাতে পারে। দেখুন; ঈদুল আযহার সালাতের সাথে সাথে কুরবাণী করার বিধানও রাখা হয়েছে। গ্রাম ও মহল্লায় এমন অনেকে বসবাস করে, মাসের পর মাস এক টুকরা গোশত জুটেনা যাদের কপালে, তাদের মন চায় একবার একটু গোশতের স্বাদ পেতে। তাদের জন্য বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা করা হল। আজ পেটপুরে গোশত খেয়ে নাও। মনের আকুতি মিটাও। সে সাথে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর সুন্নাত জীবন্ত করার প্রয়াসে অবতীর্ণ হও। বিশেষভাবে আলিম সমাজের দায়িত্ব হল, ইসলামী সমাজে চুপিসারে ও অবচেতন ভাবে যেন কোন إمعة-এর অনুপ্রবেশ না ঘটে সে দিকে তীক্ষ্ম ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা। লক্ষণ দেখা মাত্রই এর প্রতিরোধ করতে হবে। নবী আলাইহিস, সালাম উম্মাতের জন্য তার ওয়াসিয়াতে ইরশাদ করেছিলেন ঃ

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ -

"তোমাদের কর্তব্য আমার সুন্নাত এবং খুলাফা-ই রাসিদীনের হিদায়াত প্রাপ্ত কল্যাণ বারতাবাহক খলিফাগণের সুন্নাত অনুসরণ করা। সকলে সুদৃঢ় ভাবে দাঁত কামড়ে তা ধরে রাখ"।[১]

আমাদের মাদরাসাগুলির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যতো এটাই ছিল যে, তারা দীনের অতন্দ্র প্রহরী তৈরী করবে, যারা দীনের সীমান্ত রক্ষায় আত্ম নিবেদিত থাকবে, যাতে কোন চোর বা গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ না ঘটে। এখন তারাও যদি লবণের খনিতে পড়ে লবণ হয়ে যায়— অর্থাৎ যেমন দেশ তেমন বেশ এর দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে যায়, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কর্তব্য বিস্মৃত গডডালিকা প্রবাহী হয়ে যায় এবং শরী'আত অসম্মত ও শরীআত বর্জিত যে কোন গর্হিত কাজে সমর্থন দিতে শুরু করেন, অধিকন্তু তারাই সে সবের নেতৃত্বে অবতীর্ণ হন, তা হলে আর আশা-ভরসা কোথায় ? কবির ভাষায় ঃ

---

১. মিশকাত শরীফ; হযরত ইরবায বিন সারিয়াহ-(রাঃ) বর্ণিত।

چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی কা'বা-ই থেকে যদি জন্ম হয় কুফরীর; মুসলমানী রইবে তখন কোথা, জাতির রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়ে যায়, তাহলে সে জাতির অবলুপ্তি আর কতদিনের ব্যাপার।

আরবী ভাষা শেখার বদৌলতে প্রাপ্ত চাকুরীই যদি মূল হয়, তাহলে আরবী আর ইংরেজীর মাঝে ব্যবধান কি রইল? আলিমগণ 'ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া' খেতাবে ভূষিত। নবীগণ ছিলেন দীনের প্রহরী এবং দীনের ব্যাপারে অতিশয় মর্যাদাবোধ সম্পন্ন ও অনুভূতি প্রবণ। ইয়াহুদীরা হযরত মূসা আলাইহিস সাল্লামের খিদমতে আবদার করল—اجعل لنا الها كما لهم آلهة আমাদের জন্য এমন কোন প্রাকার জৌলুস পূর্ণ মাবুদ (প্রতীমা) নির্ণীত করে দিন, যেমন রয়েছে ঐ (মিশরীও কিবতী) লোকদের। তিনি নবী সুলভ তেজস্বীতার সাথে বজ্র গম্ভীর জবাব দিয়েছিলেন—

انكم قوم تجهلون ۝ ان هؤلاء متبر ما هم وباطل ما كانوا يعملون

"তোমরা তো চরম (আহাম্মক) গন্ডমুর্খের দল। (আরে) এরা যাতে (লিপ্ত) রয়েছে তাতো ধ্বংসোন্মুখ; আর তারা যা কিছু করে তা তো বাতিল ও ভন্ডুল।[১]

বিশ্ব নবীর রিসালাত যুগে এক সফরের সময় হুবহু এমনই মর্যাদা পূর্ণ ও অনুকরণশীল মনোভাব প্রসূত একটি ঘটনা ঘটেছিল। আরবের কোন কোন গোত্রের 'যাত আনওয়াত' নামে সজীব পল্লবিত গাছের প্রতি বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। তারা সে গাছে অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত, তার তলায় নৈবেদ্য পেশ করত ও বলি দিত এবং সেখানে এক দিন অবস্থান করত। গাযওয়া-ই-হুনায়ন (হুনায়ন যুদ্ধ) এর সময় গাছতলার ঐ দৃশ্য দেখে কিছু নতুন মুসলমান (যাদের অন্তরে তখনও ঈমান সুদৃঢ় হয়নি) বলে ফেলল 'ইয়া রাসুলাল্লাহ; আমাদের জন্য মনের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদনের একটি ক্ষেত্র ও কেন্দ্র নির্ধারণ করে দিন, যেমন এসব গোত্রের রয়েছে। তাদের এ প্রস্তাব হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবী সুলভ গায়রাত ও মর্যাদা বোধে কম্পন সৃষ্টি করল, তিনি বজ্রগম্ভীর জবাব দিলেন—"তোমরাতো হযরত

১. সূরা আ'রাফ: ১৩৭-১৩৮

মূসা (আলাইহিস সালাম) এর কওমের অনুরূপ ঘটনা ঘটালে। অবশ্যই বুঝা যায় যে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি সমূহের প্রতিটি পদক্ষেপ ও পদ্ধতির হুবহু অনুকরণ করবে।[১]

আলিমগণকে হতে হবে অনুরূপ তেজ ও গাম্ভীর্যতা সম্পন্ন এবং তাওহীদ ও সুন্নাত বিষয়ে মর্যাদা বোধ সম্পন্ন। আমাদের দীনি আরবী মাদরাসাগুলি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এ ধরনের ইস্পাত দৃঢ় তেজস্বী মনোভাব সম্পন্ন এবং মর্যাবোধ সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যেই। চিরদিন এ বৈশিষ্ট্য স্থায়ী ও অক্ষুন্ন রাখা এ প্রতিষ্ঠান সমূহের পবিত্র আমানত ও কর্তব্য।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

১. সীরাতে ইবনে হিশাম, খন্ড—২, পৃঃ ৪৪২, মূল রিওয়ায়াত সিহাহ হাদীছ গ্রন্থ সমূহেও রয়েছে।

দুঃসাহসী সাত তরুণের কাহিনী

[এ বক্তৃতা হয়েছিল ১২ই অক্টোবর (১৯৮২ইং) সকাল দশটায় আওরংগাবাদ আযাদ কলেজের ছাত্র-অধ্যাপক ও শহরের মান্য-গণ্য ও সুধী-জনের এক বিশাল সমাবেশে। সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন খ্যাতিমান কবি জনাব সিকান্দার 'আলী ওয়াজদ (সাবেক সদস্য রাজ্য-সভা)। অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিচিতি ভাষণ দিয়েছিলেন কলেজের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব জুলফিকার হুসাইন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর মাজহার মুহিউদ্দীন। মাওলানা নাদভী তার ভাষণ শুরু করেছিলেন সূরা কাহাফের কয়েকটি আয়াত তিলা-ওয়াতের মাধ্যমে।]

হামদ ও সালাতঃ

إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ○ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب

السموات والأرض لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ○

'ওরা একদল তরুণ, যারা তাদের রবের উপর ঈমান এনেছিল, আর আমি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম তাদের সৎ পথ চলার শক্তি। তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিয়েছিলাম—যখন তারা (ঈমানের পথে চলতে) উদ্যত হল এবং বলল, আমাদের রব তো (তিনি যিনি) আসমান ও যমীনের রব, আমরা কক্ষনো তাঁকে ব্যতীত কোন মা'বুদ (প্রতীমা) কে ডাকব না ('ইবাদাত করনা) কেননা তাহলে তো আমরা অবশ্যই অন্যায় উক্তি করার অপরাধ করে ফেললাম।

[সূরা কাহাফঃ ১৩—১৪]

সুধীবৃন্দ! আপনাদের এ প্রতিষ্ঠানে আজ আমার দ্বিতীয়বার উপস্থিতির সৌভাগ্য হল। যে মহান মনীষীর নামের[১] সাথে এ প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধ, তাঁর সাথে আমাদের প্রতিষ্ঠান (নাদওয়াতুল উলামা লাখনৌ) তার পৃষ্ঠ-পোষক পরিচালক বৃন্দ ও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক ঘনিষ্টতর।

১. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রঃ)। বিস্তারিত বিবরণ, মাওলানা নাদভী-এর পুরানো চেরাগ ২য় খন্ডে দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তিগত ভাবেও তাঁর সান্নিধ্য ও সুনজর লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এ প্রিয়তম সম্বন্ধ তদুপরি এই প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান ক্ষেত্র আওরাংগাবাদ নগর—এ দু'টিই আমার দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের এ শহর আওরাংগাবাদের সাথে জড়িয়ে রয়েছে এক গৌরবোজ্জল ইতি-হাস। সে ইতিহাস শুধু সামরিক শক্তির ইতিহাস নয়, নয় শুধু বিজয়ের ইতিহাস। সে ইতিহাস সাহসিকতা, উচ্চাবিলাস ও দৃঢ় প্রত্যয়তার। সে ইতিহাস দরবেশী ও পার্থিব বিমুখতার ইতিহাস। আমার দৃষ্টিতে আওরাংগাবাদ হল ভারতের গ্রানাডা। গ্রানাডা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমার চোখে গ্রানাডা ও আওরাংগাবাদের ইতিহাসে রয়েছে অনেক সাদৃশ্য। তবে এটি একটা স্বতন্ত্র বিষয়। যা ভিন্নভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

সুধীবৃন্দ! আপনাদের খিদমতে সূরা কাহাফ্ এর দু'খানি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। সমকালীন ষ্টাইল ও ধারায় এর শিরোনাম করা যায় এরূপে "দুঃসাহসী সাত তরুণের কাহিনী" (বা সাত তরুণের অভিযাত্রা[১]) এ কাহিনীতে মানব বংশধরদের তরুণ গোষ্ঠীর জন্য রয়েছে এক বিশেষ পয়গাম ও উন্নত আদর্শ। যে পয়গাম ও আদর্শ সর্ব-কালীন ও সার্বজনীন। যার প্রতিক্রিয়া শুধু মন মস্তিষ্ককেই প্রভাবিত করে না, বরং তা প্রতিভা, সাহসিকতা ও উদ্যম সংকল্পের ক্ষেত্রে নতুন প্রেরণা সঞ্চারে কার্যকরী হতে পারে। এ কাহিনী কখনো হৃদয় সিক্ত করে শিশির বিন্দু ঝরিয়ে, কখনো আঘাত হানে ফুল ও পাপড়ির চাবুক হয়ে। আমিও আজ তরুণদের কাছে তরুণদের কাহিনীই শোনাতে চাই। বস্তুতঃ আমি শোনাচ্ছি না বরং আল-কুরআনই তা শোনাচ্ছে। আল-কুর-আনই তাদেরকে আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে তাদের চিরস্মরণীয় করে দিয়েছে সর্বযুগের জন্য। তাদের সমাসীন করেছে 'আইডিয়েল' ও অনুসরণীয় আদর্শের আসনে। কাহিনী বিবৃত হয়েছে সহজ ভাষায়, সাবলীল ভংগীতে এবং সংক্ষেপে। কিন্তু তা অতিশয় শিক্ষাপ্রদ এবং গভীর।

১. এ সংখ্যা সম্পর্কে আল কুরআন বলেছে—"কেউ বলেন, তিনজন, চতুর্থ ছিল তাদের কুকুর, কেউ বলে পাঁচজন, ষষ্ঠ তাদের কুকুর। অনুমানে ঢিল নিক্ষেপণ। আর কেউ বলে—সাতজন, অষ্টম তাদের কুকুর... এরপর আল-কুরআন শেষ সংখ্যা উল্লেখ না করায় মুফাস্সিরগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাদের সংখ্যা ছিল সাত।

এ কাহিনীর পটভূমি নিম্নরূপ ঃ ইতিহাস খ্যাত রোম সাম্রাজ্যের অধিনস্থ শাম ফিলিস্তীন এলাকায় একটি নতুন দাওয়াতের সূচনা হয়েছিল। তখন এ দাওয়াতের বাহক ছিলেন সায়্যিদুনা হযরত 'ঈসা মাসীহ আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম। আমরা মুসলমানরাও তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করি। তিনি দাওয়াত দিলেন তাওহীদের, একত্ব-বাদের। সারা বিশ্ব তখন শিরক ও অনাচারের আঁধারে নিমজ্জিত। সে নিশ্ছিদ্র আঁধারের বুকে ক্ষীণ আলোর রশ্মি রূপে উদ্ভাসিত হল এক নতুন পয়গাম। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একটি ধ্বনি উচ্চকিত করলেন। শিরক, বংশ পূজা তথা সাম্প্রদায়িকতা, প্রথাপূজা, কুসংস্কার, বস্তুবাদ ও মানবতার নির্যাতন শোষণের বিপরীতে, তাওহীদ এবং আল্লাহ পাকের নির্ভেজাল ইবাদতের উপরে রচিত হয়েছিল তার পয়গামের মূল ভিত্তি।

কতক মানুষ তাঁর এ দাওয়াত কবুল করে তার ধারক বাহকে পরিণত হল। নতুন ব্রত নিয়ে তারা নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ল এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে দাওয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কেন্দ্রের সন্নিকটে উপনীত হয়ে সেখানে দাওয়াতের প্রচার প্রসারে আত্ম-নিয়োগ করল।

পৃথিবীর বিপ্লবাত্মক ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত অভিজ্ঞদের তুলনায় জীবনী শক্তিতে উচ্ছল তরুণরাই নতুন ফলপ্রসূ আহবানে অধিকতর দ্রুত সাড়া দিয়ে থাকে। কারণ, অভিজ্ঞতা লাভা-লাভ চিন্তা, প্রথা-সংস্কার ও আশা-নিরাশা বয়স্কদের পথে বড় অন্তরায় ও বিপত্তি সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, তরুণরা হয় সম্পর্ক বন্ধন ও আসক্তির (Attachment) বেড়াজাল থেকে মুক্ত। তাই বিপ্লবী কর্মসূচীতে তরুণরাও বয়স্কদের তুলনায় অধিক উচ্ছল ও অগ্রগামী হয়। তারা সামান্য ধাক্কায় সকল পারিবারিক বন্ধন ছিঁড়ে এগিয়ে চলে সম্মুখ পানে।

আল-কুরআন এই তরুণদের নির্দিষ্ট কোন বয়সের কথা উল্লেখ করেনি এবং এটাই আল-কুরআনের প্রকাশ ভঙ্গী। কেননা, যদি বলা হত—তারা ছিল ১৮—২০ বছরের তরুণ। তাহলে এর চাইতে অল্পাধিক বয়সের লোকেরা এ অজুহাত সৃষ্টির অবকাশ পেয়ে যেত যে, এ কথা আমাদের জন্য বলা হয়নি। এইজন্য আল-কুরআনে বলা হয়েছে انهم فتية ওরা তরুণ-দের একটি ছোট দল। আরবী ভাষায় অভিজ্ঞরা জানেন যে, فتية শব্দে বয়সের তারুণ্যের সাথে সাথে মন মেধা মস্তিস্ক এবং উচ্চাভিলাষ ও ইচ্ছা সংকল্পের তারুণ্য ও উচ্ছলতার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে। এজন্য আমি

তার তরজমায় (যুবক না বলে) 'কতিপয় তরুণ' শব্দ ব্যবহার করেছি। فتية শব্দটি বহুবচন, একবচন হল فتى—এ শব্দের আর একটি বহুবচন রয়েছে তা হল فتيان তবে فتية শব্দরূপ দশ সংখ্যায় নিম্নবর্তী বহুবচন جمع قلت নির্দেশ করে। আল-কুরআন এ শব্দরূপ দ্বারা ইংগিত করেছে যে, তারা সীমিত সংখ্যক তরুণ ছিল। এটাই চিরন্তন বিধি। যখনই পৃথিবীর বুকে সমাজ সংস্কার এবং একমাত্র নির্ভেজাল ইবাদতের আহ্বান এসেছে, তখন প্রাথমিক পর্যায়ে নগণ্য সংখ্যক লোকেরাই তাতে সাড়া দিয়েছে। আল্লাহপাক যাদের বিশেষ তাওফিক দান করেন, তারাই বিশুদ্ধ দীনি দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার সৎসাহস দেখাতে পারে।

এই আয়াতে এদের অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে আল্লাহ পাকের গুণবাচক নাম সমূহ থেকে 'রব্' গুণবাচক নামটির উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—انهم فتية امنوا بربهم। (রব এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী তরুণ দল।) এ নাম অতি অর্থবহ। কেননা, সরকার ও শাসকগোষ্ঠী প্রকারান্তরে (কথায় কিংবা কাজে) দেশ বাসীর রিযিকদাতা ও 'আহার সরবরাহক' এর দাবীদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। দেশবাসীর মনেও এ ধরনের ধারণা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল হতে থাকে যে, নিজেদের জীবন নির্বাহ ও মান ইজ্জতের জীবন যাপনের জন্য জীবনে সুখ-শান্তি উপভোগ করতে হলে সরকার ও প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, তাদের তল্পীবাহক হয়ে, তাদের পদাংক অনুসরণ করতে হবে এবং 'জ্বী হুজুর' মার্কা হতে হবে। এটাই উন্নতি ও সমৃদ্ধির সরল পথ আর তা করতে না পারলে নিরাপদ সচ্ছল জীবন যাপন প্রায় অসম্ভব। পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে আল-কুরআনের শব্দ চয়ন 'আংটির মাঝে হিরক খণ্ড তুল্য'। যার এক একটি শব্দের অভ্যন্তরে নিহিত থাকে এক একটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

তরুণ দল পৌঁছে গেল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র বিন্দুতে। যেখানে পত পত করে উড়ছে পরাক্রমশালী রোমান পতাকা। সে সাম্রাজ্যটি ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বাধিক সুসংহত সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উচ্চতম শিখরে উপনীত হওয়ার গৌরবদীপ্ত স্বীকৃতি প্রাপ্ত। সে সাম্রাজ্যটি উন্নততর আইন ও শাসনতন্ত্রে শাসিত পৃথিবীর বুকে সর্বাধিক বিস্তৃত সাম্রাজ্য ও শাহানশাহী রূপে স্বীকৃত। তারা এই সাম্রাজ্যটি ও তার সম্রাটদের নাকের ডগায় সরাসরি মুখের উপরে জনসমুদ্রের ভিড়ে দাঁড়িয়ে এই নগণ্য সংখ্যক তরুণ শ্লোগান তুলল, নিজেদের সত্যধর্ম গ্রহণের ঘোষণা

দেওয়ার সাথে সাথে তার প্রচারে ব্রতী হল, কি অদম্য সাহস ও উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল সে তরুণ হৃদয়গুলো! তাদের গৃহীত মতবাদই ছিল তখনকার বিশুদ্ধ মাযহাব, সে যুগের খাঁটি ইসলাম। কেননা, খৃষ্টবাদ তখন পর্যন্ত ছিল ভেজাল ও বিকৃতিমুক্ত। আহবায়ক দল, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পয়গামের একনিষ্ঠ পতাকাবাহীদল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ভূমিতে উপনীত হয়ে ঘোষণা দিল—আমাদের রিযিকদাতা, আমাদের প্রতিপালন ও জীবন ধারনের ব্যবস্থাপক হুকুমাত নয়। সম্রাট নয়, আমাদের রিযিক দাতা প্রতিপালক হলেন মহান আল্লাহ ربنا رب السموات والارض 'যিনি আসমান ও যমীনের রব্ প্রতিপালক তিনিই আমাদের প্রতিপালক।' এ ঘোষণা দেওয়া হল এমন এক রাজশক্তির সরাসরি মুখের উপরে যারা জীবন যাপনের সব উপকরণ রেখেছিল কুক্ষিগত করে। বাসিন্দাদের জীবন জীবিকা ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ হত তাদের হাতে, অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারাই ছিল লাভ-ক্ষতি ও কল্যাণ-অকল্যাণের সব ক্ষমতার অধিকারী। তাই সে সময় বুদ্ধিমত্তা, বাস্তববোধ ও চাতুর্যের দাবী ছিল সে রাজশক্তি ও হুকুমাতের সাথে স্বীয় ভাগ্য জড়িয়ে নেওয়া কিংবা অন্ততঃ নীরব নির্বাক নিরাপদ জীবন যাপন করা। কিন্তু তরুণরা গ্রীক পৌত্তলিক ধর্ম রোমান পৌত্তলিক ধর্ম এবং তাদের দেবদেবীদের অস্বীকার করে বসল। অথচ রোম সাম্রাজ্যের সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাষ্ট্র ও সমাজ এবং আদর্শ ও কর্মসূচী, ধ্যান ধারণা ও চিন্তাধারার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন পৌত্তলিকতার অখন্ড প্রভাব। গোটা সমাজ তখন শিরক ও অংশীবাদ এবং কুপ্রথা কুসংস্কার আচ্ছন্ন। গ্রীক ও রোমে (এবং প্রাচীন ভারতেও) আল্লাহ পাকের গুণাবলীর কাল্পনিক রূপ দেওয়া হত দেবতার আকৃতিতে। প্রতিটি দেবতার নামে স্থাপিত হত বড় বড় উপাসনালয় এবং বিশালকায় প্রতিকৃতি ভাস্কর্য। তাদের মধ্যে কোনটি প্রেমের দেবী, কোনটি স্নেহ মমতার, কোনটি দাত্রী, কোনটি যুদ্ধ-দেবতা' কোনটি প্রভাব-প্রতিপত্তির, আবার কোনটি বা রোদ বৃষ্টির। কিন্তু নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ তরুণরা এক মুখে-একবাক্যে সব অস্বীকার করে বসলো। শুরু হল আলোড়ন, তারা ঘোষণা করলো ঃ

ربنا رب السموات والارض لن ندعوا من دونه الها لقد قلنا اذا شططا

هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة ط لولا يأتون عليهم بسلطان بين ط فمن

اظلم ممن افترى على الله كذبا

"আমাদের রব্, (তিনিই, যিনি) আসমান সমূহ ও যমীনের রব্'—মালিক। আমরা কক্ষনো তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে মা'বুদ সাব্যস্ত করে ডাকব না। (তেমন করলেতো) আমরা তখন অন্যায় অযৌক্তিক কথা বলে ফেললাম। এই যে আমাদের কাওম (স্বগোত্র), এরা তাঁকে বর্জন করে আরো অনেক পূজনীয় সাব্যস্ত করে রেখেছে। এরা ওদের ব্যাপারে কোন স্পষ্ট প্রমাণ কেন পেশ করছে না ? সুতরাং আল্লার নামে যারা মিথ্যা আরোপ করে. তাদের চাইতে অধিক অনাচারী আর কে ? [সুরা কাহাফ ঃ ১৪—১৫]

এ বিবরণে আল-কুরআন আর একটি তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছে। তা হল সফলতা লাভের জন্য প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব মানুষের, দাওয়াতের বাহকদের সাহসিকতায় ভর করে প্রথম পদক্ষেপ মানুষের পক্ষ থেকে হলেই আল্লাহ পাকের মদদ এগিয়ে আসে তার সহায়তায়। তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ امنوا بربهم وزدناهم هدى —(তারা তাদের কর্তব্য পালন করে অগ্রগামী হল, তারা তাদের 'রব' এর উপরে ঈমান আনল, আর (আমার মদদ তখন সাব্যস্ত হল) আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিলাম। (অন্য এক আয়াতে রয়েছে—والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا "আমার (দীনের পথে,) জন্য যারা সাধনা করে, আমি অবশ্যই তাদের হিদায়াত দিব আমার পথের।"

মানুষ যদি এ প্রতীক্ষায় থাকে যে, কোন বিষয়, কোন বাণী স্বংক্রিয় ভাবে অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে, কিংবা তাদের কণ্ঠহার হয়ে যাবে, তবে তা হবে ভুল। প্রথম সিদ্ধান্ত নিতে হবে নিজেকেই, হিম্মত ও সাহসিকতার সূচনা করতে হবে পথ চলার, তবেই হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে মহান রাববুল আ'লামীনের মদদ ও সহায়তা। তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ وربطنا على قلوبهم (তারা অগ্রগামী হল) আমি তাদের মনের জোর ও উদ্যমকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা দান করলাম। কারণ, (আমি জানতাম যে.) সে যুগের পরাশক্তি ও পরাক্রমশালী সরকার ও সম্রাটদের সাথে ছিল তাদের প্রতিযোগিতা। তারা নিয়েছিল সরকারী মতবাদ ও ধর্ম বর্জন করে একটি নতুন দীনের দীক্ষা।

এটাই আল-কুরআনে বর্ণিত আসহাবুল কাহাফ (গুহাবাসী)-এর ঘটনা। জর্দানের পূর্বাঞ্চল সফরকালে (১৯৭৩ ইং) আমার সে গুহা দেখার

সুযোগ হয়েছে, যে গুহায় তারা আরামে ঘুমুচ্ছেন। জর্দান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহাপরিচালক গবেষক বন্ধুবর ওয়াফা আদ-দাজ্জানী সাথে থেকে আমাকে পরিদর্শন করিয়েছিলেন। সেটি তিনি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য প্রমাণ দ্বারা সে গুহাটিই আসহাবুল কাহাফের আলোচ্য গুহা হওয়া প্রমাণিত করেছেন।[১]

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যুগ যুগ ধরে এ কাহিনীর স্মরণে পদ্য কবিতা রচিত হয়েছিল এবং তা সে দেশের সাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছিল। আমি আমার 'মা'রিকা-ই-ঈমান ও মাদ্দিয়াত (ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত) গ্রন্থে তুলনামূলক পর্যালোচনার আলোকে বিষয়টি আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। ইতিহাস অধ্যয়নে এ কথাও বুঝা যায় যে, ঐ তরুণ দলের অধিকাংশই ছিল রাজকীয় দরবার সদস্যদের সন্তান। যার অর্থ এই যে, তারা (পরোক্ষতঃ) ক্ষমতাসীন সরকারের কৃপা লালিত ছিল। কারো পিতা কারো চাচা আর কারো বড় ভাই উচ্চ পদে আসীন ছিল। এ কারণে বিষয়টি আরও জটিল ও সংগীন রূপ ধারণ করেছিল। কারণ একথা বলে তুবড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার অবকাশ ছিল না যে—ক'টি অখ্যাত, অনুল্লেখ্য, ছন্নছাড়া তরুণ উন্মাদগ্রস্থ হয়ে বিদ্রোহের শ্লোগান তুলেছে। আর সরকারী ধর্ম বর্জন করার ঘোষণা দিয়ে এক নতুন ধর্মমত গ্রহণের দাবী করেছে। বরং তারা ছিল সাম্রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর ও উচ্চপদস্থদের সন্তান, যাদের সাথে জড়িত ছিল গোটা পরিবার ও পরিবারের ভাগ্যলিপি এবং মান-মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের ব্যাপার। তাদের এ আচরণ বিবিধ সমস্যার জন্ম দিল। এ পদক্ষেপের ফলে একদিকে তাদের পিতা ও অভিভাবকগণ এবং পরিবারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এক বিব্রতকর ও নাযুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। যে কোন মুহূর্তে রাজ দরবারের সামনে মাথা নত করে তাদের প্রশ্নের জবাব দানে বাধ্য হওয়ার আশংকা ছিল যে, তোমরা তোমাদের অধঃস্তন ও সন্তানদের এ বিদ্রোহাত্মক পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখলে না কেন? অন্যদিক ছিল অভিভাবক মুরুব্বীদের জন্য কঠিন পরীক্ষা।

১. দ্রষ্টব্য : ওয়াফা আদ-দাজ্জানীর গবেষণা মূলক গ্রন্থ اكتشاف الكهف واصحاب الكهف—(ইকতিশাফুল কাহফি ওয়া আসহাবিল কাহাফ (আরবী)। আমার 'মা'রিকা-ই-ঈমান ও মাদ্দিয়্যাত' কিতাবে তার রচনাকালীন সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্ণীত স্থানের উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীতে আমার সে মতের পরিবর্তন হয়েছে।

এ সুযোগ্য ও সাহসী তরুণদের অভিভাবক হিসাবে তারা ছিল তাদের ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদী। তারা স্বপ্ন দেখছিল সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

পরিবারের তরুণদের প্রতি তার অভিভাবকরা যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা পোষণ করে থাকে, এ মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি আল-কুরআন মনোহর বচন ভঙ্গীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে। হযরত সালিহ আলাইহিস্ সালাম যখন তার 'ছামূদ' কওমের কাছে তাওহীদ এবং সত্য দীনের দাওয়াত পেশ করলেন, তখন কাওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা আবেগাকুল ও মর্মাহত ভাষায় তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করল—'আমরাতো তোমাকে নিয়ে ভবিষ্যতের আশার জাল বুনছিলাম, তোমার প্রতি আমাদের মনের কোণে ছিল গভীর প্রত্যাশা। আমাদের ধারণা ছিল, তুমি সোজা লাইন ধরে (জাতি যে লাইনে চলছে) সিধা চলে আসবে এবং কিছুটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে খান্দান ও বংশের সুনাম বৃদ্ধি করবে। তুমি হবে পরিবার ও খান্দানদের গর্বের ধন-গৌরবমণি। আল-কুরআনের ভাষায় :

قالوا يصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا

সালিহ (আঃ) এর দাওয়াত শুনে—লোকেরা বলল, সালিহ! তুমি তো ছিলে আমাদের আকাংখার কেন্দ্র বিন্দু—আশার পাত্র।) এ তুমি কি করলে আমাদের সব আশা পানি করে দিলে, নতুন হাংগামা শুরু করে গোটা জাতির বিরোধীতায় অবতীর্ণ হলে, জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করলে। আল-কুরআনের مرجو শব্দের কাছাকাছি অর্থ রয়েছে—ইংরেজীর Promising শব্দে। 'আশার পাত্র' আশাপ্রদ উজ্জল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় কোন শিক্ষার্থী, কোন চৌকষ তরুণ সম্পর্কে এভাবে বলা হয়ে থাকে যে—তোমাকে দিয়ে আমাদের ভবিষ্যতের অনেক আশা ভরসা, তোমাকে নিয়ে আমাদের স্বপ্ন, তুমি আমাদের আশার পাত্র ও কেন্দ্রবিন্দু।

গণনায় এ তরুণরা ছিল স্বল্প সংখ্যক। বিভিন্ন যুক্তি ও প্রাপ্ত তথ্যে তাদের সংখ্যা 'সাত' এর অধিক না হওয়া বুঝা যায়। কিন্তু বাস্তব বিচারে তাদের সাথে জড়িয়ে ছিল কয়েক শত বিশিষ্ট লোকের ভাগ্য। প্রত্যেকটি তরুণের পিছনে ছিল তাদের পরিবার বংশ ও আত্মীয়তার ধারা। তাদের পদক্ষেপ সকলের জন্য ডেকে আনছিল মহাবিপদ সংকেত। সম্পৃক্তদের দেখা হচ্ছিল সন্দেহের দৃষ্টিতে। নির্মূল হয়ে যাচ্ছিল কত বংশের

আশা ও ভবিষ্যত, সাচ্ছন্দ ও অগ্রগতির জোয়ার হচ্ছিল ব্যাহত। অগভীর দৃষ্টিতে কেউ মনে করতে পারে যে, এ আর কি এতবড় সমস্যা। মাত্র সাত-আটটা লোকইতো! ধরে মেরে ফেললেই তো লেঠা চুকে যায়। সাতটা লোককে বিনাশ করলেই তাদের জীবন বায়ু ফুরিয়ে দিলেই বিশাল সাম্রাজ্যের কি ক্ষতিবৃদ্ধি হল? কিন্তু বাস্তব অত সহজ নয়; কারণ ব্যাপার এক ব্যক্তিরই থেকে যায় না, বিশেষতঃ সমাজবদ্ধ সভ্য দেশে এক ব্যক্তিকে একক ভাবে কল্পনা করা যায় না। (সে কল্পনা করতে পারে কবিরা, বিরহীর বর্ণনায়) অন্যথায় বাস্তব জগতে (সমাজ বন্ধন বিহীন) একাকী এক ব্যক্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। আশ পাশের অনেকের সাথেই তার সংযোগ সম্পর্ক থাকে। সুতরাং সে বিদ্রোহ দেখতে সাত ব্যক্তির হলেও তাতে সত্তর পরিবার অভিযুক্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হতে পারে। ফলে সমস্যাটিরও জটিলতর ও প্রকট রূপ ধারণ করতে পারে। বিষয়টি উল্লেখযোগ্যতার অধিকারী হওয়াতে আল-কুরআন তা শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত রূপে পেশ করেছে।

এ সমস্যার সমাধানে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল, তার বিশদ বর্ণনা আর আজকের ইতিহাস ঘেটে পাওয়া যেতে পারে না। তবে সর্বযুগের ক্ষমতাসীন চক্রের অভিন্ন দমন নীতির প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভীতি ও প্রলোভন উভয় পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছিল. অবশ্য স্থান নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয় যে, কি ধরণের ভয়ভীতি দেখানো হয়েছিল, কিংবা কোন পদ্ধতিতে লোভ-লালসা দেওয়া হয়েছিল এবং কি সোনার হরিণ ও উজ্জল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। এ ধরণের ক্ষেত্রেতো বিশেষতঃ বিপ্লবীরা তরুণ হলে ঘুষ ও ঘুষি, চেয়ার ও বুলেট তথা লোভ ও ভীতি উভয় পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, এবং বিশেষতঃ অভিজ্ঞ ক্ষমতাসীনরা ভীতির চাইতে লোভ দেখানোকে অধিক কার্যকর ও সুফল দায়ক মনে করে থাকে। এ উভয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন এমন এক মনীষীর অভিজ্ঞতা হল—'কোড়ার চাইতে তোড়া অধিক স্পর্শকাতর ব্যাপার। বুলেটের ভীতির চাইতে পদ ও চেয়ারের লোভ অধিক লোভনীয় ও মোহনীয়। শাসন দন্ডের অধিকারী ক্ষমতাসীনরা কখনো উত্তোলন করে চাবুক, আর কখনো বা তুলে ধরে মুদ্রাভর্তি থলে। সুতরাং বলা যায়, তরুণদের সামনে ঘুষ ও ঘুষি, চাবুক বা থলে বা কোড়া ও কড়ি দু'টিই এসেছিল। তারা চাবুকের আঘাত সহ্য করেছে অম্লান বদনে। আর তোড়া ভেঙ্গে দিয়েছিল তুড়ি দিয়ে, নির্যাতন সয়েছিল পিঠে, লোভ ও লাভ ঠেলে দিয়েছিল দুপায়ে আর তারা এ শক্তি, অন্তরের এ ধৈর্য, অবিচলতা, সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতা ত্যাগ ও তিতিক্ষার অধিকারী হয়েছিল মহান আল্লাহর অপার কৃপায়।

এ কথাই বলা হয়েছে—وربطنا على قلوبهم—আমি তাদের কলব-গুলিকে করেছিলাম ধৈর্য অবিচলতা মন্ডিত।"

পৃথিবীর ইতিহাস একথাই বলে যে, কোন সমাজ ও দেশ ভয়াবহ দুর্যোগ ও অবশ্যম্ভাবী অধঃপতন থেকে রক্ষা পেতে পারে এমন ক্ষণজন্ম তরুণদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে যারা ভবিষ্যতের আশা দলতে পারে দু'পায়ে, স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে অবলীলায়। উল্লেখিত তরুণদল ছিল এ মহৎ গুণে গুণান্বিত। কিন্তু তাই বলে তারা অপরিণামদর্শী নির্বোধ বা উন্মাদ (Abnormal) ছিল না। তারা ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মহারা, কিন্তু সচেতন। তাদের কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা প্রমাণ করে যে, তারা ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ অনুভূতি ও চিন্তাশক্তির অধিকারী, বিচক্ষণ ও সুবুদ্ধি সম্পন্ন সুবোধ তরুণ, তবে তাদের জীবনে একটা অভাব তাদের দৃষ্টিতে প্রকট রূপে ধরা পড়ছিল। শুধু অন্ন বস্ত্রের সহজ লভ্যতা, পেট ও দেহের চাহিদা পূরণ তাদের আত্মার প্রশান্তি সৃষ্টিতে সক্ষম ছিল না। তাদের চিন্তাধারায় ছিল—দু'বেলা পেট পুরে আহার, তাতো কোন ধনীর ঘরের কুকুরের কপালেও জোটে। কোন বড় লোকের কুকুরও হয়তো এমন খাঁটি দুধ খেতে পায়, যা অনেক দরিদ্র ঘরের সন্তানের দু'চোখে দেখার ভাগ্য হয় না। কোন কুকুর হয়ত এমন সম্পদসাচ্ছন্দে পালিত হতে পারে, যা আশরাফুল মাখলুকাত—সৃষ্টির সেরা মানুষ স্বপ্নেও দেখে না। কিন্তু তাদের মতে এমন হাজার সাচ্ছন্দে প্রতিপালিত কুকুর তেমন নিরন্ন বিবস্ত্র মানুষের জন্য উৎসর্গীত হওয়া উচিত (বরং তারও যোগ্য নয়) যে মানুষের মন সজীব ও সমৃদ্ধ হয়েছে আল্লাহর মা'রিফাত ও পরিচিতি লাভ এবং তাঁর প্রতি ঈমানের দৌলত সম্পদে। এ চিন্তার সাথে আল্লাহ পাক তাদের দান করেছিলেন সুজাতি মানবগোষ্ঠীর প্রতি মর্মবেদনা ও কল্যাণ কামনা। তাই তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হল, সম্পদ ও সম্পত্তি জীবনের লক্ষ্য নয়; পশুর মত পেট পূজা করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া কাম্য নয়। বরং আমাদের আত্মরক্ষা করতে হবে সে ভয়াবহ ধ্বংস থেকে, যা ভ্রান্ত 'আকীদা, ভ্রান্ত লক্ষ্য, ভ্রান্ত কর্মসূচী এবং জঘন্য নৈতিকতার রূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। আত্মরক্ষার সাথে সাথে নিজেদের কোন জাতি, নিজেদের পরিবার ও সমাজকেও রক্ষা করতে হবে সে অশুভ পরিণতি ও ভয়ংকর বিপদ থেকে, যা তার লেলিহান শিখা বিস্তার করে রেখেছে দেশ ও জাতির মাথার উপরে। ইতিহাস সাক্ষী, এমন অকুতোভয় সংগ্রামী মুজাহিদ-দলই উপনীত হয় সফলতার দ্বারপ্রান্তে, তারা

গোটা জাতি ও স্বদেশকে রক্ষা করে নিজেদের সুখ শান্তি ও সম্পদ সম্ভোগ উৎসর্গ করার বিনিময়ে। প্রয়োজনে তারা কুন্ঠিত ও বিচলিত হয় না জীবন বিলিয়ে দিতে। যুগ যুগ ধরে মানবতার ইজ্জত বেঁচে রয়েছে তাদেরই অবদানে। দেশ ও জাতির ভাগ্যে জুটেছে শান্তি নিরাপত্তা কল্যাণ ও ইনসাফের নিশ্চয়তা। সততা-সত্যবাদিতা ও হক-এর দাওয়াতের অবিরাম ধারা জীবন্ত রয়েছে তাদেরই খুনের স্রোতে।

প্রিয় তরুণেরা! আমাদের এ দেশ এখন চরম দুঃখী, ঈমানী এবং মানবিক ও নৈতিক অবক্ষয় ও নৈরাজ্যের শিকার। দীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে সৃষ্ট ভয়াবহ নৈরাজের কথা এখন আলোচনা করার অবকাশ নয়। সেজন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র সময় ও সুযোগ। (তাছাড়া কলেজে অধ্যয়নরতদের মাঝে মুসলিম অমুসলিম উভয়ই রয়েছে) নৈতিক নৈরাজ্য বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করছি। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এখন আমাদের অবস্থা সংক্ষেপে প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মৃত্যু বিভীষিকায় পতিত মুমূর্ষ ব্যক্তির অবস্থা। দেশ এখন দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংস গহবরের প্রান্তে কিংবা আগ্নেয়গিরির লাভা মুখে। করপশন ও দুর্নীতি ছেয়ে আছে গোটা দেশে মহামারীরূপে, দায়িত্ববোধ, কর্মোন্মাদনা, কর্তব্যপরায়ণতা ও কর্তব্য পালনে শ্রম দানের আগ্রহ এবং স্বদেশ প্রেম ও স্বদেশবাসীর প্রতি হামদরদী-সমবেদনা এ সব এখন কল্পনার সোনার হরিণ। প্রশাসনের যে কোন চেয়ারের দিকে লক্ষ্য করবেন, দেখতে পাবেন যে, প্রতিটি চেয়ারধারী যেন উঁৎপেতে বসে রয়েছেন পকেট ভর্তি করার মতলবে। পেট ও পকেট পূর্তী না করে যারা কাগজ ভাজ (অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন) করে চলছেন, তারা ঈর্ষা যোগ্য মানুষ (কিংবা করুণার পাত্র অধম হতভাগ্য)। সার্বিক অবস্থা এমনই বলা যায় যে, যখনই কেউ কোন কাজ নিয়ে কোন অফিসার কেরাণীর সামনে এল, তার চেহারা নিরীক্ষণ শুরু হল, মতলব—কি পরিমাণ (ঘুষ) বাগানো যাবে তা আন্দাজ করা। তার মুখাবয়বতে কি অভিব্যক্তি রয়েছে, কোন বিপদের সংকেত-লক্ষণ রয়েছে কিনা তা দেখার জন্য নিরীক্ষণ নয়, বরং আগন্তুকের জীবনের স্তর-মান (STANPARD) পরিমাপ করাই উদ্দেশ্য। এ মানসিকতার পরিণতিতে প্রবাসীদের দেশে প্রত্যাবর্তন আনন্দের বিষয় না হয়ে দুঃখ বেদনার বোঝা বহনে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রবাস শেষে আত্মীয় মিলনের কাংখিত আনন্দের পরিবর্তে মন থাকে দুরু দুরু শংকায় শংকিত। অজানা বিপদ ও বেইজ্জতির আশংকা মাটি করে দেয় স্বজন মিলনের আনন্দ বাসনাকে। প্রতি মুহূর্তের চিন্তা হয়ে যায় কত ঘুষ যেন দিতে হবে? এমন কেন হতে পারছেন না

যে, প্রবাস প্রত্যাগতরা আমাদের ভারতীয় ভাইয়েরা সীমান্তে (তা জল বা বিমান হোক) উপনীত হয়ে অনুভব করবে স্বর্গীয় সংবর্ধনা, উপলব্ধি করবে আনন্দ ও মর্যাদা।

আমার এ সব কথা বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আপনারা এ মুহূর্তেই টই কলেজ (ও শিক্ষা জীবন) ছেড়ে দিয়ে সমাজ সংস্কারে লেগে পড়ুন, দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করুন, তা আমি বলতে পারি না, কেননা, আমি নিশ্চিত জানি যে, আপনাদের পক্ষে দেশ ও জাতির একনিষ্ঠ সেবা করা তখনই সম্ভব হবে, যখন আপনারা উত্তম ছাত্র জীবন যাপন করবেন। উত্তমভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে সুনাম ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করবেন। নিজের ও প্রতিষ্ঠানের সুনাম সহকারে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করবেন। আমার বাসনা এতটুকু যে, কর্মজীবনে আপনারা কর্মপালন, দায়িত্ববোধ সম্পন্ন ও কর্তব্য সচেতন হবেন; দেশ প্রেমিক হবেন এবং মুসলমান হলে এক একজন খাঁটি মুসলিম হবেন। আপনাদের মাঝে থাকবে সহায়তার মনোবৃত্তি উদ্দীপনা। আরামের আনন্দের তুলনায় কাজ করে আপনারা অধিক আনন্দবোধ করবেন। সারা দেশের শাসন ও প্রশাসন এখন নড়বড়ে ও ভগ্নপ্রায়। সার্বিক শৈথিল্য ও ঊদাসীনতা গ্রাস করে ফেলেছে গোটা জাতিকে। জনজীবন এখন বিপর্যস্ত। অভিযোগ করব কোন বিভাগের বিপক্ষে, কাঁদব কোন শাখার পরিণতিতে, সারা দেহ জরাগ্রস্ত ক্ষত-বিক্ষত মালিশ প্রলেপ আর কত লাগানো যায়!

আমার মুসলিম সন্তানেরা! বিশেষভাবে বলছি, বিষয়গুলি অন্যদের ক্ষেত্রে নাগরিক ও নৈতিক কর্তব্য হতে পারে, তোমাদের জন্যতো দীনী ও মাযহাবী ফরয ও কর্তব্য। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ○ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ○ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو
وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ○

"মাপ-পরিমানে ওজন বাটখারায় কম দেয় যারা, তাদের জন্য অকল্যাণ-ধ্বংস (তাদের কপাল পোড়া) যারা অন্যদের থেকে মেপে নেওয়ার সময়তো পুরো-পুরি (কাটা ঝুলিয়ে) দেয়।" আল্লাহ পাক এ আয়াতে কত অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন এবং বাস্তব তথ্য প্রকাশ করেছেন। মাপে কম দেওয়া শুধু দুধের দোকান বা আটা-নুন তেল মরিচের মুদী দোকা-

নের সীমিত ব্যাপার নয়। 'তাতফীফ'—মাপে কম দেওয়া, দাঁড়ি মাপার কারবার করা—জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। আমাদের সমাজ ও প্রশাসনিক কাঠামো ঠকবাজ, ও লুটেরা বর্গীয় রূপ ধারণ করেছে। সকলেই এ ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত। নিজের হক ও প্রাপ্য কড়ায় গন্ডায় উসুল করা এবং সেজন্য প্রয়োজনে হাতাহাতি লাঠালাঠি করা আর অন্যের হক দেওয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করা বা আধাআধি দেওয়া স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

এ হেন পরিস্থিতি আপনারা যদি ভারতের বুকে মান-মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকতে চান, নিজেদের অবস্থান তৈরী করে তা সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করতে চান তাহলে তার একমাত্র উপায় হল--বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল দীন অনুসরণ, উন্নত ও নিখুঁত নৈতিকতা অর্জন এবং সমাজ সেবার উন্নত ও আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। এদেশের বুকে নেতৃত্ব লাভে অভিলাষীদের জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে দীনের তৎকালীন তারবিয়াত ও শিক্ষা দীক্ষা। আল-কুরআনের হিদায়াত ও পথ নির্দেশনা এবং নবী আলাইহিস সালাম ও সাহাবীগণের আদর্শ ও উন্নত জীবন চরিতের আলোকে জীবন গঠন করা। (সূরা কাহাফে বিবৃত) তরুণদের জীবনকর্মে জীবন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বিপদসংকুল কর্মপ্রান্তরে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও আশা বাসনা জলাঞ্জলী হলেই কোন জাতি রক্ষা পাবে বিপর্যয় ও বিনাশের চরম হুমকী থেকে, এবং আর একটু সাহসিকতা ও উদারতা নিয়ে অগ্রগামী আশা পোষণ করা যাবে মানবতার কল্যাণ সাধনের; কবি আকবার ইলাহাবাদী যথার্থই বলেছেন—

نازکیا اس پہ جو بدلا ہے زمانہ نے انہیں—
مرد وہ ہیں جو زمانہ کو بدل دیتے ہیں

যুগের স্রোতে ভেসে চলেছো, এ নয় গৌরব তোমার, কালের প্রবাহ রুখে দেয় যে পুরুষ-তারি মাথায় পরাও গৌরব মুকুট।"

গন্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলা গর্ব ও গৌরবের বিষয় নয়। যুগ ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে মানব কল্যাণে প্রবাহিত করাই পৌরুষদীপ্ত তরুণের অবদান।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

জীবন ও চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন অপরিহার্য

[১৭ই অক্টোবর, ১৯৮২ ইং আওরাঙ্গাবাদ জামে মসজিদে' প্রদত্ত ভাষণ]

হামদ ও সালাত ঃ

সুধীবৃন্দ ও মুসলিম ভাইগণ, আমাদের মজলিসের কারী সাহেব-এর তিলাওয়াতে এ আয়াতখানিও ছিল—

وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ○

"বলুন, ইয়া রব্! (হে প্রতিপালক) আমাকে উত্তমভাবে কল্যাণের সাথে প্রবেশ করান এবং উত্তমভাবে কল্যাণের সাথে নিষ্ক্রান্ত করুন, আর আমাকে আপনার পক্ষ থেকে সহায়ক প্রতিপত্তি (শক্তি) দান করুন! [সূরা ঃ আল-ইসরা'—৮০]

আওরাঙ্গাবাদে উপস্থিতি আমার সত্য—ইতিহাস অধ্যেতার স্মৃতি ভাণ্ডারে আলোড়নের ঝড় তোলে। স্মৃতিগুলি ছবি হয়ে ভেসে উঠে দৃষ্টির সম্মুখে। আর এটা কোন অসাধারণ ব্যাপার বা অবাক কান্ড নয়। ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য এটা একটা কঠিন সমস্যা যে, তারা তাদের ইতিহাস অভিজ্ঞতা থেকে সমুক্ত হয়ে কোথাও অবস্থান করতে পারে না। ইতিহাসের নির্যাস মেঘের শামিয়ানা হয়ে তার দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। নিষ্কৃতির শত চেষ্টা করেও সে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন না। আওরাঙ্গাবাদকে আমি 'ভারতের গ্রানাডা নামে উল্লেখ করে থাকি। ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমার এ উপমার রহস্য সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। কেননা, উভয়ের (স্পেনের গ্রানাডা ও ভারতের আওরাঙ্গাবাদ) মাঝে গভীর সামঞ্জস্য বিদ্যমান। গ্রানাডায় ছিল আরবী ইসলামী হুকুমাত। যে হুকুমাত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গোটা ইউরোপে ইসলামের ডংকা বাজিয়েছিল। গোটা ইউরোপ ছিল তার প্রভাবের সামনে নতজানু। তার অবদান কৃপা থেকে ইউরোপ কোন দিন নিজেকে মুক্ত

করতে পারবে না। কারণ, ইউরোপকে সে-যা দিয়েছে তা আক্ষরিক অর্থে-ই অনেক ও অঢেল। হায়! যদি সে সারা ইউরোপকে ইসলাম সম্পদে সম্পদশালী করে দিত। এটা ছিল তার বড় ধরণের বিচ্যুতি। আর সে বিচ্যুতির মাশুল স্বরূপে আল্লাহ পাক তাদের দেশটিই ছিনিয়ে নিলেন।

আরবরা ইউরোপীয়দের দিয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো। যুক্তি ও বাস্তবতার আনুগত্য এবং অনুসন্ধান-গবেষণার পন্থা ও অভ্যাস। আধুনিক ইউরোপের উন্নতি অগ্রগতির পেছনে এ সবের প্রভাব ও কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। আন্দালুস মুসলিম স্পেনই ইউরোপকে 'কিয়াস' ও অনুমান নির্ভরতা থেকে 'ইসতিকরা' ও গবেষণার পথ দেখিয়েছিল। 'কিয়াস' হল অনুমান ভিত্তিক অর্থাৎ মেধা ও অধ্যয়নের বলে কোন মূলনীতি ও সার্বিক বিধি (থিওরী) স্থির করে একক সমূহকে তার সমান্তরালে নিয়ে আসা এবং এ ভাবে সার্বিক বিধি থেকে কোন বিশেষ এককের মান ও অবস্থান নির্ণয় করা। আর 'ইস্‌তিক্‌রা'' হল—এককগুলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ-নিরীক্ষণের পরে তার সমষ্টিগত ও সার্বিক অধ্যয়নের গবেষণালব্ধ নির্যাস থেকে কোন মূলবিধি ও থিওরীতে উপনীত হওয়া। অর্থাৎ এককগুলি প্রমাণ ও সাক্ষী দেয় যে, সার্বিক ও মৌলিক বিধি এমনই হওয়া উচিত।

ইউরোপের উন্নতি অগ্রগতি এবং অতি প্রাকৃত দর্শন (তাত্ত্বিক দর্শন) বর্জন করে বিজ্ঞান—টেকনোলোজি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পন্থা অবলম্বনের পিছনে ইস্‌তিকরা ও গবেষণার মূলনীতি মেনে নেয়াই কার্যকর কারণ। আর এ পন্থা মুসলিম স্পেনের ঋণ ও অবদান। স্পেন তাদের দিয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গ্রীক দর্শনের গবেষণালব্ধ ফলাফল। স্পেনীয়রা গ্রীক দর্শন আহরণ করে তা আত্মস্থ করার পর তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে এবং তা-ই অনূদিত হয়েছে ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায়।

কিন্তু তাদের মারাত্মক বিচ্যুতি ছিল ইউরোপে বিশুদ্ধ ও মৌলিক ইস্‌লামের প্রসার না ঘটানো। তারা জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতি করলেন, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও কাব্য সাহিত্যের উন্নয়নে নিমগ্ন হলেন। যা-হোক, এটা এ মজলিসের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে আওরাংগাবাদ মনের পুরান ক্ষত তাজা করে দেয়, তাই আবেগ উদ্বেলতা আমাকে বাধ্য করেছে এসব কথা আওড়াতে। সেখানে যখন আরবী ইসলামী সালতানাতের পতন ঘটল, তখন এখানে ভারত বর্ষে তার সূচনা হল। ওখানে পতনের শেষ পরিচ্ছেদ লেখা হচ্ছিল, আর এখানে ভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে আসছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের ভাল-মন্দ ও দোষ-ত্রুটি যাই থাক, তা মুসলিম

অধিকারের একটি প্রতীক ছিল। ইতিহাস বিদগণ এবং সমালোচকগণ তার যতই সমালোচনা ও দোষ বর্ণনা করুন, আমরাতো তাদের বহু বিস্তৃত অবদান ও নীতিসমূহের স্বীকৃতি দানে বাধ্য।

অবশ্য এ সমালোচনা উত্থাপনে আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে, তাহলো এ বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে, হুকুমাত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আল্লাহ পাকের একটি বড় নি'য়ামাত অনুগ্রহ অবদান। আল-কুরআন ও রাজা রাজত্বকে বড় নি'য়ামাত রূপে উল্লেখ করেছে। কওমের প্রতি হযরত মূসা আলাইহিস্‌ সালামের বাণী উদ্ধৃত করে আল-কুরআন বলেছে—

يقوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا ـ

واتكم ما لم يؤت احدا من العالمين ٥

"হে আমার স্বজাতি! স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়া'মাত-অনুগ্রহ; তিনি যে তোমাদের মাঝে নবী-পয়গাম্বরদের মনোনীত করলেন এবং তোমাদের বানালেন রাজা-বাদশা; আর তোমাদের দিলেন এত সব কিছু, যা তিনি দেননি (অন্য) কাউকে, জগতবাসীদের মাঝে।

[সূরা মায়িদা : ২০]

মোটকথা, রাজ্য ও রাজ-ক্ষমতা একটি মহান নি'য়ামাত। কিন্তু তা কোন কারখানায় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বা বহনযোগ্য কোন বস্তু নয় যে, ইচ্ছা করলেই তা কোথাও থেকে বহন করে অন্য কোথাও স্থাপন করা হবে, কিংবা কোথাও থেকে তুলে অন্য কোথাও লাগিয়ে দেয়া যাবে। অথবা তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপন্ন হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও শাসনাধিকার হল বিশেষ ধরনের কর্তব্যবোধ সৃষ্টির প্রতি সহযোগিতা, সমবেদনা নৈতিকতা, জনসেবা ও জনকল্যাণের উদ্দীপনার একটি বহিঃপ্রকাশ ক্ষেত্র। অর্থাৎ কোন জামাআত, কোন দল বা জাতি যখন বিশেষ ধরণের স্বভাবজাত ও নৈতিক গুণাবলী কর্ম অবদান সমৃদ্ধ হয়, তখন তাদের সে স্বভাব ও নীতিবোধের এ কর্ম-অবদানের বিস্তৃতি ও গভীরতার মানদন্ডে কোন ভূখন্ডে তাদের যোগ্যতা-পারদর্শীতা প্রকাশের অবকাশ দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে আল-কুরআন ইরশাদ করেছে—

ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون ٥

"অতঃপর আমি তাদের (পূর্বসূরীদের) পরে তোমাদের পৃথিবীর বুকে খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত বানালাম, (উদ্দেশ্য,) যাতে দেখে নিতে পারি, তোমরা কেমন কর্ম-আচরণ কর। [সূরা : ইউনুস—১৪]

মৌলিক বিষয় হল, আভ্যন্তরীণ চরিত্র ও বাহ্যিক আচার অবদান অর্থাৎ এমন জীবন পদ্ধতি- যা শুধু সালতানাত ও রাজাধিকার নয়, বরং তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—আল্লাহর মা'রিফাত ও পরিচিত, আল্লাহর দরবারে প্রিয় হওয়ার স্বীকৃতি এবং দৃষ্টির গভীরতা, কল্যাণ প্রসূতী দান করার মাধ্যমে,হিদায়াত এবং আল্লাহ পাকের অসীম রহমাত প্রাপ্তির দরওয়াযা খুলে দেয়। রাজ্যাধিকার ও শাসন ক্ষমতাতো এর একটা অতি সাধারণ ও লঘু প্রতীক মাত্র। ঈমানী সীরাত ও ঈমানী নৈতিকতা হল এমন বিষয় যার ফলে দিক দিগন্তে ও ব্যাপক জনতার মাঝে বিস্তৃত হয় বিজয় প্রভাব, ক্ষমতা প্রদত্ত হয় মানুষের মনের উপরে শাসন চালাবার। ঈমানী চরিত্র দান করে এমন বাদশাহী, যার তুলনায় হাজার (পার্থিব) রাজত্ব তুচ্ছ ও নগণ্য। কারণ সব কল্যাণের উৎস ও প্রস্রবণ সে মূল বিষয়টি তা সীরাত ও ঈমানী চরিত্রবল। একবার কোথাও আমি বলেছিলাম যে, "সংকল্প সংগঠন জন্ম দেয়, সংগঠন সংকল্প জন্ম দেয় না।" প্রকৃত বিষয় হচ্ছে সঠিক সংকল্প। ব্যক্তি ও সমষ্টির মনে সঠিক ও যথার্থ সংকল্পের উদ্ভব হলে শত শত প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব লাভ করতে পারে। সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান ক্ষণস্থায়ী ও ভংগুর। এই সজীব হয়, আবার নির্জীব ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার পুনরুজ্জীবিত হয়, আবার বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের সংকল্প সঠিক ও যথার্থ রূপে ধারন করলে, নিয়ত ও বাসনা নির্ভুল ও সঠিক হলে, মানব জীবন ও স্বভাব চরিত্র শরী'আতের কাঠামোতে গড়ে উঠলে এবং আল্লাহ-পাকের পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টি সাপেক্ষ পন্থায় গঠিত হলে, মোট কথা মেধা মস্তিস্ক যদি সঠিক গন্তব্য সঠিক গন্তব্যাভিমুখে এমন নির্ভুল গতিতে অগ্রসর হয়ে প্রতিটি লোম-কূপ থেকে এ ধ্বনি উঠতে থাকে যে—

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن

لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ○

তখন তাদেরতো তাদের গোলামদের পদতলে লুণ্ঠিত হতে থাকে কিসরা ও কায়সারের তাজ—রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি হয় অবলুণ্ঠিত। কবি ইকবালের ভাষায়—

در شبستان حرا خلوت گزید — قوم و آئین و حکومت آفرید

ماند شبها چشم او محروم نوم — تا بتخت خسروی خوابید قوم

"নির্জন হেরা গুহায় একান্ত রজনীমালা,
নিভৃতে রচিয়া চলে জাতি ও হুকুমাত।
ধ্যানমগ্ন মহামানবের বিনিদ্র যামিনী;
কওমের পদতলে লুটায় কিসরার তখত।

(অর্থাৎ হেরা পর্বতগুহায় নিভৃত রাত্রি বাস কালেই জন্ম নিয়েছিল একটি নতুন জাতি, রচিত হচ্ছিল তার হুকুমাত ও শাসনতন্ত্র। হেরার বিনিদ্র রাতগুলিই অদূর ভবিষ্যতে তাঁর কওমকে মনোবল দিয়েছিল পারস্য সম্রাটের সিংহাসনকে একটা সাধারণ শয্যা বা চাটাই মনে করার।)

কিসরা হোক কিংবা কায়সার, পারস্য সম্রাট হোক কিংবা রোমান আমপায়ার পার্থিব জৌলুস ও জাঁকজমক তাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগাতে পারেনি। বহুমূল্য রাজকীয় সিংহাসন তাদের দৃষ্টিতে ছিল নগণ্য একটি মাদুর কিংবা চাটাই। আর তাতে খচিত হিরা-পান্না-মোতি মুক্তা ছিল তাদের কাছে মাটির ঢেলা মাত্র। সিংহাসন ও মাটির শয্যায় কোন ব্যবধান তারা দেখতে পায়নি।

তাহলে লক্ষ্যণীয় আসল বিষয়টি কি? মূল ব্যাপার কোথায়? আল্লাহ পাকের মনজুর হলো, তাঁর হিকমত ও মহাজ্ঞানের ফয়সালা হয়ে গেলে নতুন রাজ্য ও রাজশক্তির উদ্ভব হয়। আল্লাহর হিকমতের 'তাকাযা' ও দাবী অনুরূপ হলে আরও বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও অস্তিত্ব লাভ করতে পারে। আমাদের (পূর্বসূরীদের) সম্বলহীন দরবেশগণ ছিন্ন-বস্ত্র আল্লাহ ওয়ালা ফকীরগণের অনেকে আপনাদের এ মাটিতে আরামে ঘুমিয়ে রয়েছেন, তারা হুকুমাত করতেন রাজা-বাদশাহদের উপরে। হযরত খাজা বুরহানুদ্দীন গারীবের জীবনী ও ঘটনাবলী পড়ে দেখুন, আর পড়ুন হযরত খাজা মুঈনুদ্দীনের ঘটনাবহুল জীবনী। একটি ঘটনা বলছি। শায়খ যায়নুদ্দীনকে তাঁর সমকালীন বাদশাহ দরবারে তলব করলেন, তলবকারী ছিলেন সে যুগের সর্বাধিক ক্ষমতাধর সম্রাট। কোন কারণে তাঁর মিযাজ বিগড়ে গিয়েছিল। শায়খ যায়নুদ্দীন কি করলেন? খাজা বুরহানুদ্দীনের মাযারে গিয়ে লাঠি গেড়ে দিলেন—দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে বললেন, এবার আস! দেখা যাক কার কত সাহস, কার কত বুকের পাটা! তুলুক দেখি আমাকে এখান থেকে? অবশেষে রাজ ক্ষমতাই তাঁর সমীপে অবনত হয়েছিল, তিনি আত্ম মর্যাদা বিসর্জন দেননি। ইতিহাসে রয়েছে এমন আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত।

মোটকথা, মূল নিয়ন্ত্রক হল সীরাত সৃষ্টি করা চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা। আল-কুরআনে যার শিরোনাম— ... أدخلني আগমণ ও প্রস্থান, প্রবেশ ও নিষ্ক্রমন হবে কল্যাণকরতার সাথে। প্রবেশ ও প্রবেশাধিকার হবে তোমার মর্যী ও বিধি মুতাবিক প্রস্থান ও প্রত্যাগমনও হবে তোমারই মর্যী ও নির্দেশিকা মুতাবিক। এ বিষয়টিকেই বলা হয়েছে— مدخل صدق এবং مخرج صدق "কল্যাণ ও মংগল হয়ে আগমন, কল্যাণ ও মংগল হয়ে বিদায় গ্রহণ।" আর সে ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হবে— এভাবে— واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا (তোমার দেয়া শক্তি সমর্থ-কে বানাও আমার সহায়ক) অর্থাৎ—কল্যাণ ও মংগল সাধনের শক্তি সামর্থ সরবরাহ হবে তোমার মহান দরবার ও ভাণ্ডার থেকে। অর্থাৎ—আপনি ব্যতীত মদদ দাতা কোন সত্ত্বা নেই। আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমার মাঝে শক্তি সৃষ্টি করে দিন। মুসলমানদের শক্তি সাহসের রহস্য এখানেই নিহিত।

আর রাজত্ব, তা ক'দিন কার স্থায়ী হয়েছে। সালতানাত ও রাজত্ব স্থায়ী বিষয় হলে খিলাফতে রাশিদাহ স্থায়ী হয়ে যেতো। পরবর্তী যুগের কোন সাম্রাজ্যের কথা বললে—আব্বাসী সালতানাত স্থায়ী হত। যার অধিকার ও বিস্তৃতি ছিল এশিয়া আফ্রিকার গোটা সভ্য অঞ্চলের উপরে। আমাদের ভারতে মুঘল শাহান শাহী কত বড় সালতানাত ছিল, কিন্তু তা-ও বিলীন হয়ে গিয়েছে। মোটকথা, এ সব বিষয় (রাজ্য ও ক্ষমতা) আল্লাহ পাকের নি'মাত। তিনি কাউকে তা দান করলে তা থেকে উপকার লাভে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। আমি তাকে তুচ্ছ বিষয় বলতে চাচ্ছি না। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, তা মুসলমানদের জন্য জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার নয়। এমন ব্যাপার নয় যে, সালতানাত ও রাজ্য হারিয়ে ফেললেই মুসলিম উম্মাহও বিলুপ্ত বা নির্জীব হয়ে যাবে। আর রাজ্যাধিকার পেলেই উম্মাত জীবন লাভ করবে। কারণ, এ উম্মাতের অবস্থান সালতানাতের ঊর্ধ্বে। উম্মাত রাজ্যের ঊর্ধ্বে; রাজ্য উম্মাতের ঊর্ধ্বে নয়। কেননা, সালতানাত উম্মাতের কল্যাণের জন্য, উম্মাত সালতানাতের উদ্দেশ্যে সৃজিত নয়। সীরাত ও চরিত্রই রাজ্য জন্ম দেয়। বরং রাজত্ব ও ক্ষমতার চাইতে উন্নততর ও ঊর্ধ্বতম বিষয় জন্ম দেয়। তেমন চরিত্র খোদ আল্লাহ পাকেরও

প্রিয়। তার পুরস্কার স্বরূপে আল্লাহ সারা বিশ্বের সপ্ত মহাদেশের ক্ষমতাও দান করতে পারেন। এবং তা দান করেছেনও। যেমন হযরত সুলায়মান আলাহিস্ সালামকে; কখনো বা অন্য কোন মহান চরিত্রের অধিকারী কোন প্রিয় বান্দাকে। তবে মানদণ্ড এ আয়াতেই ......وقل رب أدخلني অর্থাৎ—"আমার জীবন আমার মরণ, আমার আচার-আচরণ, আদান-প্রদান, আমার উঠা ও বসা, আমার প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিটি পদক্ষেপ (ইয়া আল্লাহ) তোমার মর্যী ও সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত। আল-কুরআনের নিজস্ব ভাষায় এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা যায়— (যার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে নবী আলাইহিস-সালামকে)

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ○ لا شريك له

وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ○

"বলুন, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মৃত্যু বরণ, (সব-ই) আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের (সন্তুষ্টি সাধনে) নিবেদিত, যার কোন শরীক (অংশী) নেই; আর আমি এ বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছি; আর আমি আত্মসমর্পণকারী সর্ব প্রথম মুসলিম।"

[সূরা : আল-আনআম—১৬২]

মুসলিম জীবন গড়ে ঢেলে সাজাতে হবে শরীয়তের কাঠামোতে। কুরআন ও হাদীছের মানদণ্ডে, এবং নবী-চরিত্রের আদর্শে। মনচাহী ও কামনার দাস রূপে নয়। গমন-প্রত্যাগমন, আচার-আচরণ আদান প্রদান এবং উঠা-বসা, চলা-ফেরা সব হবে শরীয়াত নিয়ন্ত্রিত, প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত নয়। প্রবৃত্তি পূজারী হয়ে হুকুমাত ও শাসন চালানো যাবে না, প্রবৃত্তি বশীভূত হয়ে অন্যের হুকুম ও শাসন মেনে নেয়া যাবে না। কামনার তাড়নায় কাউকে বশীভূত করা হবে না। কামনা চরিতার্থের সার্থে কারো সামনে অবনত হওয়া যাবে না। এ সবই হচ্ছে—

أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق

যে কোন কাজ, যে কোন পদক্ষেপ সূচিত ও পরিচালিত হবে শরী'আতের দলীলের ভিত্তিতে। প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি মুহূর্তে লক্ষ্যণীয় হবে—আল্লাহ্ পাকের মর্যী ও বিধান। আল্লাহ্ পাকের হুকুম অবনত

হও' হলে তাই করতে হবে, হুকুম যদি 'থেমে যাও' হয়, তবে তা-ই করতে হবে। সাহাবা-ই-কিরাম ছিলেন এর বাস্তব নমুনা। কবি (আলতাফ হুসাইন) হালী সাহাবী প্রসস্তিতে বলেছেন—

بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ انکی
شریعت کے قبضہ میں تھی باگ انکی
جہاں کردیا نرم نرمائے وہ
جہاں کردیا گرم گرمائے وہ

[সাহাবী গণের (রাঃ) শরীআত নিয়ন্ত্রিত জীবন]

"অকারণে ফুঁসে উঠেনি কভু অগ্নি তাঁদের
শরীআত নিয়ন্ত্রিত ছিল লাগাম তাঁদের
নম্রতার স্থান-কালে কোমল নম্র মাটির সমান
তেজস্বীতার ক্ষেত্রে তাঁরা দীপ্ত তেজীয়ান।"

(অর্থাৎ—ব্যক্তি স্বার্থে তাঁরা কখনো উত্তেজিত বা অবনমিত হবেন না। শরীআতের নির্দেশে মাথা ভুলুন্ঠিত করতেন, কিংবা আগুনের তেজে ফেটে পড়তেন। ন্যায়ে উদার অন্যায়ে কঠোর ছিল তাঁদের জীবনের মূল নীতি। (হযরত আলী (রাঃ) এক কাফিরের বুকে তরবারী চালাতে উদ্যত হলেন, কাফির তাঁর গায়ে থু থু ছিটিয়ে দিলে শান্ত ভাবে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। বিস্ময়াভিভূত কাফিরের প্রশ্নের জবাবে বললেন তোমার ব্যক্তি সত্ত্বাকে ঘৃণা করি না। ঘৃণা করি তোমার কুফরী ও আল্লাহ—দ্রোহীতাকে। তোমাকে হত্যা করা উদ্দেশ্য, তোমার কাফির সত্ত্বাকে বিলীন করার উদ্দেশ্যে। আর তা ব্যক্তি স্বার্থে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নয়; আল্লাহর দীনের সপক্ষে ক্রোধের কারণে. তোমার থু থুর পরে হত্যা ইখলাস ও নিষ্ঠাকে কুলষিত করতে পারে—অনুবাদক।)

হযরাত! ইতিহাসের অনুরাগী পাঠক হিসাবে পুরাতন স্মৃতি আমাকে জ্বালাতন করছে, মনের মাঝে তুলছে ঝড় আলোড়ন। সে ব্যাপার সতন্ত্র। কিন্তু আল-কোরআনতো চিরন্তন চির সজীব গ্রন্থ এবং আল-কুরআন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আগত যুক্তিবুদ্ধি সমৃদ্ধ জীবন্ত সমাধান, ইসলামী চরিত্র গঠনই মুখ্য বিষয়। অর্থাৎ প্রবৃত্তির চাহিদা এবং ব্যক্তি স্বার্থ ও সাময়িক স্বার্থ চিন্তাকে শরীআতের সামনে অবনত করে দিয়ে তার অনুগত ও আজ্ঞাবহ বানাতে হবে। মিথ্যা মর্যাদা ক্ষণিকের সুনাম

ও বাহ্বা লাভ, খ্যাতির স্পৃহা, সমসাময়িকীদের দৃষ্টিতে মর্যাদার আসন লাভ করা তুচ্ছ বিষয়, মুখ্য নয়। মুখ্য হল আল্লাহ পাকের বিধান, আর আল্লাহ পাকের বিধান অর্থ তিনি আমাদের কি ধরনের জীবন পছন্দ করেন. তা অনুসন্ধান করা এবং চলমান ক্ষেত্রে ও সময়ে ইসলামের দাবী কি তা খুঁজে বের করা। যাবতীয় সাধ্য সাধনা রাজনৈতিক ও সার্থ সামাজিক সব পদক্ষেপকে পরিমাপ করতে হবে স্হানীয় সুফলের মানদণ্ডে। সব শ্রম ও অধ্যবসায় আবর্তীত হবে মুখ্য উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দু ঘিরে। সামাজিক স্বার্থে বা উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে নয়। বরং ইসলাম ও ঈমানের দাবীর ভিত্তিতে।

সারা বিশ্বে আজ ছড়িয়ে রয়েছে মুসলিম জাতি। এমন কোন দেশ রয়েছি কি, যেখানে আপনাদের দেশের লোকেরা নেই! কিন্তু তাদের এ বিশ্বজোড়া বিস্তৃতির উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য একটাই, দ্বীন ও ঈমানের দাওয়াত, প্রসারের জন্য নয়। মানবতার প্রতি মর্মবেদনার কারণে নয়। ইংলন্ড, কানাডা, আমেরিকা এমনকি আরব দেশ সমূহের ভয়াবহ অধঃপতনে ব্যথিত ও দুশ্চিন্তা গ্রস্হ হওয়ার কারণে তারা বাড়ী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েনি। সুতরাং তা—أخرجني مخرج صدق। কল্যাণে রতে বহির্গমন নয় এবং ঐসব দেশে প্রবেশ করা ও أدخلني مدخل صدق। কল্যাণ উদ্দেশ্য প্রবেশ নয়। জীবিক ও অর্থ উপার্জনের স্বার্থ তাদের দেশ ছাড়া করেছে। অর্থ উপার্জন মনোবৃত্তিই তাদের অন্যত্র প্রবেশ করিয়েছে, স্বার্থ হাসিলের দাবীতে তারা মক্কা ছেড়ে নিউইয়ার্ক যেতে কুণ্ঠিত হবে না। আবার স্বার্থ হাসিলের সুযোগ দেখা দিলে মক্কায় চলে আসতে পিছপা হবে না। কিন্তু তা এ উদ্দেশ্য হবে না যে, সেখানে হারাম শরীফ রয়েছে। বরং এ উদ্দেশ্যে যে, সেখানে রয়েছে অর্থ উপার্জনের সুযোগ সুবিধা, আপনার অবিশ্বাস হল যে কোন মুহূর্তে যাচাই করে দেখতে পারেন। কাজেই তাদের উদ্দেশ্যে— مدخل صدق ও مخرج صدق এর বিধান অনুযায়ী আমল করা নয়। অথচ তা ছিল আল্লাহ্র হুকুম, যার তা'লীম ও শিক্ষা দেয়া হয়েছিল মহান্ নবীকে এবং তাঁর মাধ্যমে ও অসিলায় উম্মাতকে শেখানো হল—

رب ادخلنی مدخل صدق "আমাদের জীবন, মৃত্যু, সন্তুষ্টি, ক্রোধ, সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বিচ্ছেদ এবং আমাদের ভাঙ্গা গড়া আল্লাহর মর্যী ও বিধানের অনুযায়ী করে নিতে হবে। তাহলে দেখতে পাবেন তার অবর্ণনীয় সুফল, আল্লাহ পাকের অপার দান মহিমা। আমার অভিযোগ ও মাতম এটাই যে, আমাদের চরিত্র বিগড়ে গেছে, মন মানসিকতার আমূল বিকৃতি ঘটেছে। শরীআত এখন আমাদের পরিচালক নয়, আমাদের সমস্যাবলী সমাধানে সালিস ও শরীআতের বিচারক হওয়ার শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে। শরীআতের স্থানে আমরা কামনা ও প্রকৃতিকে বিচারক নিয়োগ করেছি, স্বার্থই আমাদের বিচার কর্তা হয়েছে। এক কথায়, এখন মুসলমাদের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন চারিত্রিক বিপ্লব সাধন। যার লক্ষ্য হবে জীবন আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের মর্যী ও চাহিদা মুতাবিক গড়ে তোলা, এমন মানবিকতা সৃষ্টি করা যে, তিনি যা করাবেন, তা-ই করব, তিনি যা বর্জন বিসর্জনের নির্দেশ দিবেন, যা ছিনিয়ে নিবেন, তা পরিত্যাগ করব।

একটু আত্ম বিশ্লেষণ ও আত্ম-যাচাই করে দেখুন। নামেতো আমরা সকলেই মুসলমান। এতেও আল্লাহ পাকের শুকুর আদায় করছি। কারণ, তা-ও আল্লাহ পাকের হাযার নি'মাত মেহেরবাণী। কেননা, নবী-গণের সম্পদ আমাদের হাতে রয়েছে, আমাদের কাছে রয়েছে ঈমানের মহান দৌলত। আমি তাঁর মর্যাদা অস্বীকার করছি না, তার গুরুত্ব ক্ষুন্ন করছি না। কিন্তু আমাদের চরিত্র ও নৈতিকতার অবস্থাটা কি? যখনই কোথাও কোন স্বার্থের গন্ধ পেয়ে যাই, তাতেই আকৃষ্ট ও ধাবিত হই। রাজনীতির ক্ষেত্রে চেষ্টা-সাধনার লক্ষ্য—সংসদ ও এসেম্বলীতে সদস্য পদ লাভ করা, কোন কমিটির সদস্য হতে পারা, বেতন-ভাতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা, সুনাম সুখ্যাতির অধিকারী হওয়া, জীবনের অপ-রাপর ক্ষেত্রেও অবস্থা অভিন্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিয়ে-শাদীর ব্যাপার ধরুন। তাতে যা কিছু হচ্ছে—সঠিক কিংবা অঠিক উদ্দেশ্য একটাই। সমাজে খ্যাতি লাভ, নাম ফুটানো, হৈ চৈ আর ধুমধামের চর্চা হোক। সকলে বলুক—অমুকের বিয়ে হয়েছে—কি শান শওকাত কি ধুম ধাম! কত সজ্জা কত জৌলুস আর কত যৌতুক উপহার। একে কি বলা যায় কল্যাণে গমন ও কল্যাণে প্রস্থান? মুসলমানের সর্বপ্রথম কর্তব্য তো হল ও কথা জিজ্ঞাসা করা যে, এ বিষয়ে, এ মুহূর্তে এ পদক্ষেপে আমাদের জন্য শরীআতের বিধান কি? আমাদের জন্য এটা জাইয কি না?

সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) জীবন গড়েছিলেন সে ভাবেই। মদের মত অসক্তি সৃষ্টিকারী বস্তু—(ছেড়ে দিলেন নির্দ্ধিধায়) কেমন তার আশক্তি—(আল্লাহ হিফাযতে করেছেন আমাদের সকলকে তাঁর ফযল ও মেহেরবাণীতে) কবির ভাষায়—چھٹتی نہیں ظالم منہ سے لگی ہوئی এত দুষ্ট! হটানো যায় না তারে কোন কৌশলে!)

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হোল্ডারের যুগে মদ নিরোধ অভিযান পরি-চালিত হয়েছিল, তার বিস্তৃত রিপোর্ট পড়ে দেখুন, কত বুদ্ধি কৌশল কত প্রচার প্রপাগান্ডা চালান হল, কত কোটি ডলার ব্যয় করা হল, জীবন জ্ঞান সাধনা করা হল। মারাত্মক ক্ষতির বর্ণনা দিয়ে তা বর্জনে উৎসাহিত করা হল। কিন্তু ইতিহাস বলছে, সমস্যা সমাধান না হয়ে আরো জট পাকিয়ে গেল। মদখোরদের যেন যিদ চড়ে গেল যে, না মদ ছাড়া যেতেই পারে না! অবশেষে প্রেসিডেন্ট ও সরকারকে হার মানতে হল, মদখোররা হার মানলো না। প্রতিপক্ষে, আসুন সাহাবীগণের (রাঃ) যুগে, মদীনার বুকে জীর্ণ চাটাই হোগলায় উপবেশন করে আল্লাহ পাকের বান্দা রাসূল ঘোষণা করলেন—

يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس

من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ○

"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, প্রতীমা (বদী) ও লটারী, তীর, (এসবই) অপবিত্র পংকীলতা ও শয়তানী কাজ কারবার, তাই, তা থেকে দূরে সরে থাক; যাতে সফলতা লাভ করতে সক্ষম হও। [মায়িদাহ্—৯০]

এ ঘোষণার ধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে যেতে না যেতেই প্রতিধ্বনি এল انتهينا انتهينا "ছেড়ে দিলাম, ফিরে গেলাম" প্রত্যক্ষদর্শীরা মদীনার তখনকার পরিস্থির বিবরণ দিয়েছে যে, ওষ্ঠের গন্ডী ছাড়িয়ে, যে মদ মুখ গহ্বরে প্রবেশ করছিল, তাও আর সামনে এগুতে পারে নি এক বিন্দুও নয়, তখন তখনই উগড়ে ফেলা হয়েছে, যে যেখানে বসা ছিল সেখানেই উগড়ে দিয়েছে, প্রত্যক্ষদর্শীরা তার বিবরণ দিয়েছে যে, এ

ঘোষণার পর মদীনার অলি গলিতে শরাব প্রবাহিত হতে লাগল, যেমন যেমন পানি প্রবাহিত হয়ে থাকে। এবারে আসুন পরবর্তী ইতিহাসে, মহান খলিফা হযরত উমর (রাঃ)এর খিলাফত কালে। তখন রোম পারস্য ও সিরিয়া মুসলমানদের পদানত, সম্পদ প্রাচুর্যে ঢল নেমেছে, বহির্বিশ্বের সভ্যতা সংস্কৃতির সাথেও পরিচিতি ঘটেছে। কিন্তু শরাব পান করার ঘটনা ক'টি ঘটেছে ?

আজ অভাব যে বস্তুটির যা সাধন করতে পারবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, যা পরিস্থিতির আমূল রদ বদল ঘটতে পারে, তাহলো ইসলামী সীরাত ও ঈমানী চরিত্র গ্রহণ করা। সম্মিলিতভাবে সে প্রয়াস চালাতে পারলে তার সুফলতো হবে অভাবনীয়। আল-হামদুলিল্লাহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেহনত শুরু হয়ে গিয়েছে। আসুন, প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে নিবেদিত হই, সবাই মিলে সম্মিলিত কর্মসূচীও গ্রহণ করি। সর্বস্তরের লোকই এ মজলিসে রয়েছে। আসুন ! অন্ততঃ আমরা (উপস্থিতরা) প্রত্যেকে এ সংকল্প করি, শরীআতকে অগ্রাধিকার দিব, আল্লাহর আইনও শরীআতের বিধান জ্ঞান নিয়ে তদানুসারে আমল করব, ছোট বড় যে কোন কাজ হোক; রাজনীতি ও রাজনৈতিক নির্বাচনের ব্যাপার থেকে শুরু করে বিয়ে—শাদী, খাত্না (মুসলমানী) আকীদা, বাড়ী ঘর তৈরী ও উদ্বোধন সম্পদ সম্পত্তির বন্টন, আয়-ব্যয়, উপার্জন, পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ সব ব্যাপারেই আগে দেখে নিতে হবে, শরী'আত তার অনুমতি দেয় কিনা ? সে বিষয়ে শরী'আতের বিধান কি ?

আমাদের মাঝে এরূপ মন-মানসিকতা জন্ম নিলে সব চেষ্টাই ফলবতী হবে, ফলবতী হবে এখানে আপনাদের উপস্থিতি, আর আমার আগমন ও আপনাদের সাথে আলাপনও হবে অর্থবহ। অন্যথায় তা হবে—[illegible]—এলাম, বসলাম, কতক্ষণ বক্ বক্ করে উঠে গেলাম। খোদা করুন আর এমন যেন না হয়।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে একই অবস্থা চলছে। আমরা বলে অবকাশ পাচ্ছিনা, আপনাদের শোনার অভ্যাস দূর হচ্ছে না। এভাবে চলতে পারে না, কোন অর্থবহ সুফল হাতে আসা উচিত। আসুন, যিনি সালাতে অভ্যস্ত নন আসন্ন জুহর থেকে আমরণ অংগীকার করুন সালাত আদায়ে আর অবহেলা করবেন না। আর এক ওয়াক্তও কাযা হতে দিবেন না। আল্লাহ না করুন, কোন না-জাইয বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে থাকলে এ মুহূর্তে তাওবা করুন, আর নয়, হাত ধুয়ে ফেললাম।

মুসলমানরা রাজনীতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে, সব দিন, সব জায়গায় এ মায়া কান্না শুনতে শুনতে কান বধির ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে, প্রাণ আই টাই করছে। আর নয় ! প্রথম জ্ঞান হওয়ার বয়স থেকেই দেখে আর শুনে আসছি, এমন কোন জলসা—অনুষ্ঠান সমাবেশ-সম্মিলন হয় না; যেখানে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার জন্য মায়া কান্না কাঁদা হয় না। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নেই, নেই কোন সংকল্প, ফল হচ্ছে কিছুই। সর্বাগ্রে ও সর্বাধিক প্রয়োজন স্বভাব-চরিত্রের পরিবর্তন সাধন' অন্যথায় সাধিত হবে না কিছুই, আল্লাহ পাক যখন তাঁর প্রিয় রাসূলকেও নির্দেশ দিলেন এবং শিক্ষা দিলেন, ওযীফা রূপে দায়িত্ব অর্পণ করলেন, দু'আ শেখালেন বল—

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ ... وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ০

তাহলে আমরা সাধারণ মানুষদের হিসাব-নিকাশ কোথায় ? কোন সাধারণ আইনদাতাও তার আইনের পরিবর্তন—ব্যতিক্রম ঘটায় না। আর এতো আল্লাহ পাকের বিধান, তবে বিধানের মূল কথা হল—তোমার আত্ম পরিবর্তন ও আত্ম সংশোধন আগে সাধন করবে—তাহলে আসবে আমার মদদ ও নি'মাত—ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ

بِعَهْدِكُمْ ...

"ওহে বণী ইসরাঈল; স্মরণ কর আমার সে সব নিয়ামাত (ও অনুগ্রহ) যা আমি তোমাদের ইনআম (দান) করেছিলাম। আর পূরণ কর সে অংগীকার, যা তোমরা আমার সাথে করেছিলে; তাহলে আমিও পূর্ণ করব সে অংগীকার যা, আমি তোমাদের সাথে করেছি।

[আল-বাকারা ঃ ৮০]

অর্থাৎ—"হে বণী ইসরাঈল—(সে কালের শ্রেষ্ঠ সম্মানিত জাতি—)তোমরা আল্লাহ পাকের ইহ্সান—অনুগ্রহ স্মরণে রেখে আমার সাথে কৃত অংগীকার পূরণ করলে আমিও তোমাদের সাথে কৃত অংগীকার পূরণ করব।

এটাই সফলতা প্রাপ্তির ক্রম বিন্যাস, অথচ আমরা চাচ্ছি' আল্লাহপাক আমাদে সাথে তাঁর ওয়াদা পূরণ করবেন, পরের কাজ পরে দেখা যাবে। এ যেন সেই দু'আর মত যে, ইয়া আল্লাহ আমাকে এক লাখ টাকা দাও, তা হলে অর্ধেক তোমার নামে খরচ করব। আর একান্ত আমাকে বিশ্বাস না হলে, তোমার অর্ধেক তুমি রেখে দাও, আমার পঞ্চাশ হাজার আমাকে দিয়ে দাও।—আল্লাহ পাকতো 'আলীমুন' খাবীর—সব জানেন, সব সূক্ষ্যাতি সূক্ষ্ম বিষয়ে খবর রাখেন। অন্তর্যামী—অন্তরের অন্তর্স্হলের সব অবস্হা ও চিন্তা—ধান্দা জানেন তাই মনের মাঝে কি দুরভিসন্ধি রয়েছে, তা তাঁর অজানা থাকে না।

আমাদের অবস্থাতো এই যে, সব অভিযোগ; সব আল্লাহ্‌র নামে—এমন কেন হচ্ছে? আখেরী নবীর পেয়ারা উম্মত কেন দুর্দশাগ্রস্ত। শ্রেষ্ঠ উম্মাত কেন অপদস্হ ও পর্যুদস্ত। কেন তারা সব দেশে সব ক্ষেত্রে মার খাচ্ছে? আরে ভাই! নিজের দিকেইতো একটু দেখবেন, আপনি কোন ভাল-টা করছেন? আমরা কি করে চলছি। আমাদের জীবনে কোন পরিবর্তনটা সাধন করেছি? এতদিন যে, ওয়াষ—নসীহত চলছে, তাবলীগ জামাত মেহেনত করে যাচ্ছে, কিন্তু তাতে রদ-বদল কি ঘটেছে। বিয়ে শাদীতে সেই কুপ্রথা-কুসংস্কারের কোন ব্যতিক্রম হয় নি। মুসলমানদের মাঝে অপব্যয়ের স্বভাব অপরিবর্তীত। এশহরেই কোথাও যাওয়ার পথে দেখলাম এখানে আলোক সজ্জা, সেখানে আলোকসজ্জা, মন আশংকা করল হয়ত কোন মুসলমান বাড়ীই হবে। কি জৌলুস সে সজ্জার! মনে হচ্ছিল যেন সব আলো, আর বাতি ওখানে একত্রিত করা হয়েছে। আমরা নিজের অবস্হান থেকে সামান্য হটতে রাযী নই। এখানে বেশ অবিচল আমরা। দশ বছর আর বিশ বছর আগে অবস্হা যেমন ছিল' যেমন জীবন পদ্ধতি ছিল—আজও তেমনি রয়েছে। সালাতে যাদের অনিয়ম ছিল, তারা নিয়মানুবর্তী হয় নি, যারা (মদ) পান—আপ্যায়নে অভ্যস্ত ছিল, তাদের পান-আপ্যায়ন অপরিবর্তীত রয়েছে। সম্পদ, সম্পত্তি বান্দার হক ও লেন দেনে দীনদারী—বিশ্বস্ততা যাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় ছিল, আজও তারা তাকে—ফালতু মনে করে। যা যেমন ভাবেই আসুক অধিকার করে নেয়া হচ্ছে—আর অভিযোগ আল্লাহ কেন......। (আমি বলতে চাই) আপনাদের এই দেশের কথাই ধরুন। আপনারা সততা সত্যবাদীতা অর্জন করুন। নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করুন। সহধর্মীতা—সমবেদনায় গুণান্বিক হোন, আপনাদের মাঝে জন্ম লাভ করুক মানুষের জীবন ও সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, জাগ্রত হোক, দেশ

রক্ষার পরিপূর্ণ চিন্তা ও সংকল্প। তাহলে তখন এটা জোর জবরদস্তীর বা অবাস্তব ব্যাপার হবে না যে; আল্লাহর বিধানতো রয়েছেই—মানব স্বভাবের বিধান হিসাবে আমি জোর গলায় বলতে পারি, আপনাদের কাছে এপ্রস্তাব নিয়ে আসা হবে বার বার অনুরোধ খোশামোদ করা হবে—দেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে, আপনারাই এর বিহিত ব্যবস্থা করুন, শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করুন। কারণ এ গাড়ী আর চলছে না। এটাই মানব প্রকৃতি; মানুষ আপনাকে পছন্দ করে, আপনার হাতে কাজের দায়িত্ব চায়, তাদের সময় বাঁচিয়ে আত্মরক্ষা করে আপনার অধীনে পরিচালিত হতে চায়। মানুষের এ স্বভাব চিরন্তন, যখন তারা জেনে ফেলবে যে, আপনাকে দিয়েই তাদের কাজ সমাধা হতে পারে, আপনিই তাদের সমস্যার সাধান দিতে পারেন। তাহলে কোথায় থাকবে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, কোথায় তলিয়ে যাবে গোত্র-গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িকতা। সকলেই এক বাক্যে অনুরোধ—প্রস্তাব করবে, আপনিই দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে শেষ রক্ষা করুন।

আপনি সংঘাত—সংঘর্ষে লিপ্ত থাকবেন, অথচ কাজ কিছুই করবেন না, এভাবে পরিচালনার নেতৃত্ব অধিকার করা যায় না। নেতৃত্ব লাভের পন্হা অভিযোগ আর অভিযোগ করতে থাকা নয় যে, আমাদেরও এ অধিকার দিতে হবে, আমাদের দাবী মেনে নিতে হবে। নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করুন, তখন দেখবেন, সংখ্যালঘু হওয়ার প্রশনতো উহ্যই থেকে যাবে, তখন এক ব্যক্তি এককভাবে তার দীনদারী ও বিশ্বস্ততা আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া এবং যোগ্যতার বলে সকলকে দমিয়ে অবনত করে দিতে পারে—এবং স্বীকৃতি আদায় করতে পারে তার দক্ষতা—প্রতিভা। রাজনীতির মাঠের অভিযোগ-চিৎকার, রাজনৈতিক বাদ—প্রতিবাদ মিছিল হরতাল অনেক হয়েছে। কিন্তু আমরা আমাদের চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটাইনি, ফলে আমাদের অবস্থাও রয়েছে যথার্থ।

আমাদের প্রতিটি ব্যক্তি এ সংকল্প করে নিক যে, সে যেখানেই থাকুকনা কেন, যে কোন বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট এবং চৌকিতে তার নিয়োগ—অবস্থান হোক না কেন, সে প্রমাণ করে দিবে যে; সে একজন সৎ ও সত্যবাদী মানুষ; সে একজন কর্মঠ কর্মী, হক্‌ ও ইনসাফের ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমের তার দৃষ্টিতে নেই কোন ব্যবধান; হারাম পয়সার দিকে চোখ তুলে তাকানও সে নিজের জন্য হারাম মনে করে। এমন

(পরীক্ষামূলক ভাবে) কিছু দিনের জন্যই করে দেখুন না, তখন আমাদের এই দেশের রূপরেখা কি দাঁড়ায়। আপনি কোন মসনদে অবস্থান করতে পারেন! আমাদের বোধদয় ঘটুক— এ বলেই শেষ করছি।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○

কাশ্মীর উপত্যকায় নিজেজাল তাওহাদের পয়লা পয়গাম এবং তার প্রথম পতাকাবাহী

কাশ্মীরে ইসলাম তলোয়ারের জোরে নয়—রূহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছিল

[এ বক্তৃতা ১৪০২ হিজরীর পহেলা মুহাররাম (৩০শে অক্টোবর, ১৯৮১ খৃঃ) রোজ শুক্রবার শ্রীনগর জামে 'মসজিদে জুম'আর সালাতের পূর্বে এক বিরাট মুসল্লী সমাবেশে প্রদত্ত হয়। এতে শ্রীনগর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার কয়েক হাজার মুসলিম অংশ গ্রহণ করেছিল।]

বাদ হাম্‌দ, সালাত, দু'আ ও মুনাজাত:

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ○ وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ اَرْبَابًا ○ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

আল্লাহ্ পাক বলেন: "কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক কিতাব, হিকমত ও নবুওত দান করবার পর সে মানুষকে বলবে যে, 'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও, এটা তার জন্য শোভন নয়; বরং সে বলবে তোমরা রব্বানী হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর, এবং ফিরিশতাদিগকে ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদেরকে নির্দেশ দেবে না। তোমাদের মুসলিম হবার পর সে কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দেবে?" [আল-'ইমরান-৭৯-৮০ আয়াত]